সপ্তম অধ্যায়

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত লোকভাষা ও চিত্রকল্প

কবিতার ভাব বিচার কায়া-বিচারকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। এই দ্বিবিধ বিচারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কবিরা থাকেন দু'ধরণের। (১) যুগ-স্রষ্টা কবি (২) যুগ-সৃষ্ট কবি। যুগন্ধর কবি আপন প্রতিভার যাদুদণ্ডের স্পর্শে নির্মাণ করেন এক দূরবিস্তারী পরিসীমার বৃত্ত - যে বৃত্তের কেন্দ্রে তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে কল্পনা করা অসম্ভব। তাঁরই অনুসরণে অনুগত পায়ে হাঁটে চরণ, ছন্দ, তাঁরই নির্দেশে শ্রেণিময় হয়ে দাঁড়ায় ভাব, ভাষা-আধার। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় এ ধরণের কবির সংখ্যা নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়। আর এক কবি আছেন যাদের 'যুগ-সৃষ্ট' কবির বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায়। সমকালের কথা এঁদের কবিতায় প্রকাশ পায় ঠিকই, কালাতিক্রমী মনোভাবও পরিস্ফুট হয় অনেকের কবিতায়। কিন্তু এঁরা কেউই পারেন না আপন প্রতিভার ক্ষমতায় স্বতন্ত্র যুগ নির্মাণ করতে।

কবিতার ভাব ও কায়া বিচার প্রসঙ্গে যে কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হল এই যে একজন কবিকে বুঝতে হলে একটা ঐতিহাসিক কাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়, লক্ষ্য করতে হয় তাঁর ক্রম পরিণতি, বিশ্লেষণ করতে হয় তাঁর কবিতার ভাষা, আঙ্গিক ও রচনাশৈলী, বিচার করতে হয় তাঁর ছন্দ গড়া ও ভাঙার কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গুলোকে। একজন মৌলিক শক্তিমান কবির ধর্ম হল একটা 'ফর্ম' ভেঙে আর একটা ফর্মে অনায়াসে চলে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত 'ফর্ম' কে অতিক্রম করা। একজন কবি যখন পরিণতির দিকে এগোতে থাকেন তখন তিনি টান টান ভাষায় কথা বলেন, তাঁর শব্দ ব্যবহার হয় আড়ম্বর হীন। এক্ষেত্রে সাগরের উপমা টেনে বলতে হয়, সাগর যতই গভীর হয় ততই উপরের ফেনা-তরঙ্গ শান্ত হয়ে অন্তর্লীন স্রোতের তীব্রতা বাড়ায়। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক কবিই তার দৃষ্টান্ত মূলক প্রমাণ রেখে গেছেন বাংলা কবিতায়। এঁদের কবিতায় একদিকে যেমন আছে প্রেম-জীবন-মৃত্যু-সময় বিষয়ক দার্শনিক চিন্তা, তেমনি আছে ভাবনা ও বোধের দিক দিয়ে নস্টালজিয়া - যাতে নাগরিক জীবনের বদ্ধতায় কবি-চিত্তের অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। এই সব কবিদের অনেকেই চেয়েছিলেন

লোকজীবন-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিশুদ্ধ হাওয়ার দাক্ষিণ্যে জীবনকে সরলীকৃত করে উপভোগ করা। এঁদের অনেকের কবিতায় তাই দেখি দেশ, গ্রামজীবন, সমকাল ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা ও শিল্পদায়িত্ব। এই দায়িত্ব-সূত্রেই তাঁরা ব্যবহার করেছেন লোক-রক্ষা ও লোক-পালনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অসংখ্য দেশজ শব্দ ও চিত্রকল্প যাতে রয়েছে কালচেতনা ও লোকচেতনার সংমিশ্রণ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতার বাহন যে গদ্যগন্ধী ভাষা তা সপ্রতিভ, দ্রুতগতি, প্রসারিত, নমনীয় এবং যে কোনো চিন্তা প্রকাশে সক্ষম। এ যুগের কবিরা পুরোনো কাব্য ভাষা ব্যবহারে তৃপ্ত নন। তাঁরা কবিতার ভাষাকে ঘষে মেজে শাণিত করে তুলেছেন। শব্দ ব্যবহারে তাঁদের কোনো কুণ্ঠা ছিল না। এই কুণ্ঠাহীনতা যে কতদূর যেতে পারে তা ভাবা যায় না। বহু 'স্ল্যাং' শব্দ অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে এ সময়ের কবিতায়। আবার, এ যুগের অনেক কবিই বিশ্বাস করতেন যে লোকজীবনের মুখের ভাষাকে কাব্যে ব্যবহারে মাধ্যমে জনজীবনের সান্নিধ্যে আসা যায়। লোকসাহিত্যের ভাষায় নির্ভরশীল সেই সত্য সমকালের অথচ চিরন্তন-একথাটা অনেক কবিই সে সময় আশ্চর্যভাবে অনুভব করেছিলেন। লোকজীবন তথা লোকসাহিত্যের ভাষা যে শুধু রস-সাহিত্যের নয়, সংস্কৃতির রূপের আধারও বটে, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক কবিই এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁদের অসংখ্য কবিতায় লোকসাহিত্যের প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের কবিরা কবিতার বলয় ভেঙে এক নতুন পরিসরের সংকেত আমাদের দিতে চেয়েছেন। তাঁরা দেশজ প্রাণসত্তাকে তাঁদের কবিতায় রূপ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক পতন-অভ্যুদয় ও জাতিগত ধ্যান-ধারণাকে মননে স্থান দেন নি কেবল, সেই সঙ্গে লোকসংস্কৃতির রূপ রেখাটিও তাদের কাব্যিক ক্রমবিকাশে উপস্থিত হয়েছে। কাব্য রচনায় কবিদের একান্ত নিজস্ব মন অপেক্ষা দেশাশ্রিত মন অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কবিরা তাদের সহজ মানসিকতায় একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে লোকজ ও দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে কবিকে দেশজ সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে এবং তাকে ভালবাসতে হবে। এযুগের অনেক কবিই বিশ্বাস করতেন যে দেশজ ইতিহাসকে আশ্রয় করেই কাব্য-কবিতার

ইতিহাস গড়ে ওঠে। দেশজ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সহস্রবর্ষ ব্যাপী জীবনধারাকে স্বীকার করে নিয়ে কবিরা কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং এগুলি কবিতার শরীরে নতুনতর ব্যঞ্জনা দান করেছেন। লোকসংস্কৃতি নির্ভর এইসব উপাদান বাক্য ও পদের বিন্যাসে অনেক কবিতায় নতুনতর রূপ লাভ করেছে। কবিদের অনেকেই মূল উপাদানকে ভেঙ্গে নতুন ভাবে সাজিয়ে অথবা তার অংশ মাত্রকে অবলম্বন করে অসাধারণ চিত্রকল্প রচনা করেছেন।

জহুরী যেমন হীরে-পান্না দিয়ে সোনার লতাকে আসলের মতো করেন, কবিও তেমনি সন্তর্পণে শব্দগুলি ব্যবহার করে আপন জগৎ রচনা করেন। যে কবির শব্দজ্ঞান যত নিপুণ, তাঁর কবিতা তত পরিপাটি। শব্দ দর্পনের মতো। তাতে ধরা পড়ে কবির ব্যক্তিত্ব, বৈদগ্ধ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, যুগ-পরিবেশ।

বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে যুগ বদলে গেছে, বদলায়নি আধুনিকতার সন্ধান-স্পৃহা। বিজ্ঞান অনেক আগেই এসেছিল। এখন প্রযুক্তি আমাদের জীবন-ধারাকে আমূল পরিবর্তন করতে শুরু করল। দুই যুগ চিন্তানায়ক -ফ্রয়েড ও মার্কস এসে আমাদের প্রথাসিদ্ধ চিন্তাধারাকে ওলোট-পালট করে দিলেন। অবচেতনা ও সমাজ চেতনায় আমরা বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে নতুন করে ভাবিত হলাম। আমাদের এই যুগ-পটভূমিকায় আছে দুই মহাযুদ্ধের অবস্থান। ক্লান্তি বেড়েছে, বিষন্নতা বেড়েছে, অবসাদ বেড়েছে। ক্লান্ত, বিষন্ন কবিরা ছায়া খুঁজলেন জীবনের মহীরুহ তলে। থেমে থাকল না আমাদের আধুনিকতার সন্ধান। প্রতি দশকে, প্রতি যুগে আবিষ্কারকের আগ্রহ নিয়ে কবিরা খনন করেছেন মাতৃভাষাকে, খুঁজে নিতে চেয়েছেন প্রতিটি সম্ভাবনাকে। কারো হাতে বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছে প্রাকৃতজন ভাষা- যা তথাকথিত আভিজাত্যের প্রতীক নয়, অনন্ত মাধুর্যও নয়।

বলা বাহুল্য, বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নের কবিতার ইতিহাস ভাষার ইতিহাসকে বাদ দিয়ে নয় কখনোই। তাই উপরের কথাগুলি কবিতার ভাষা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আর সেই কারণেই এযুগের কবিতায় দার্শনিক সাফল্যের পাশাপাশি এল লোক-সমাজ চেতনা-ঋদ্ধ উচ্চারণ।

আঙ্গিকের আলোচনা ভিন্ন কবিতার সমালোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার, অলংকার প্রয়োগ, শব্দ চয়ন, ছন্দ-ব্যবহার, বাক্য বিন্যাস প্রভৃতির আলোচনা অপরিহার্য। এই সময়ের প্রায় সব কবিই তাঁদের কাব্য প্রকরণে কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আর সেই কারণেই তাঁরা প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারা, প্রচলিত - অতি প্রচলিত শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, বিদেশি শব্দের পাশাপাশি 'কাব্যিক' শব্দও ব্যবহার করেছেন খেয়াল-খুশি মতো। এতে কাব্যভাষা শুচিবায়ু মুক্ত হয়েছে। বাংলা কবিতায় ভাষা ব্যবহারের এই প্রবণতা অবশ্য নতুন সৃষ্টির পথ-সন্ধান নয়। কারণ অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক আগে থেকেই বাংলা কবিতায় শৈলী ও প্রকরণের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন-রেখা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ- এঁরা সবাই শব্দ চয়ন ও ছন্দের পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

[২]

কাব্য-শৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে চারটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পায় সেগুলি হল ঃ (১) শব্দ প্রয়োগ (২) বাক্য প্রয়োগ (৩) অর্থ প্রয়োগ (৪) ধ্বনি ও ভাব সংযোগ।

কবি যখন কোনো শব্দ প্রয়োগ করেন তখন তার সাথে ধ্বনি ও ভাবের গভীর সম্বন্ধ থাকে। কোনো কবি যখন তাঁর কবিতায় লোকোপাদান ব্যবহার করেন তখন তা বিশেষ শব্দ চয়নের দ্বারা কিভাবে শিল্পিত রূপ লাভ করল তা অবশ্যই বিচার করে দেখতে হয়। কবি তাঁর পছন্দের যে শব্দগুলি কাব্যকায়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে লোক-উপাদানকে কাব্য-শৈলীর উপযোগী করে তোলেন সেগুলি তখন শুধু কাব্যের বহিরঙ্গ উপাদান হয়ে থাকে না, কাব্য-শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে নতুন রূপ পায়। কাব্য রচনার নির্মাণরীতির সঙ্গে শব্দ ব্যবহারের সম্পর্ক যে সুনিবিড়, কবি আল মাহমুদ অনেক কবিতায় তার সাক্ষর রেখেছেন। বহু চলতি শব্দের টুকরো দিয়ে তিনি সাজিয়েছেন তাঁর কাব্য-কায়া। কথ্য ভাষায় বিশেষ দেশজ রীতিকে তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। গদ্যগন্ধী শব্দের ব্যবহারও তিনি কম করেন নি। শব্দ ব্যবহারে তিনি 'কবি-প্রসিদ্ধির' অনুসরণ

করেন নি। অতি চলতি, গ্রাম্য, দেশজ, শব্দের ব্যবহারে কবি আল মাহমুদ মুখের ভাষা ও কার‍্য ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়েছেন এইভাবে -

১. এসেছ হাটে ব্যাগ ভরা মেলার তৈজস
পুতুল, মাটির নাও, ঘুম ঘুম খেজুরের রস
আছে হাতি, লাবাতি, মাটির সানকি একজোড়া।
('বেলা শেষে কে বালক')

২. কাউয়ার মতো মুনসি বাড়ির দাওয়ায়
দেখব বসে তোমার ঘষামাজা
বলবে নাকি, এসেছে কোন্ গাওয়ার
('ফেরার পিপাসা')

৩. আমি তোর মোট নেব, তোরঙ্গটা দিস মা আমাকে
রূপোর মাদুলি তুই বেঁধেছিলি স্বপ্ন না দেখার
তবু কেন জননীগো খোয়াবের অসুখ সারেনা
('ফেরার পিপাসা')

উপরের অংশগুলি আল মাহমুদের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের অন্তর্গত। অতি চলতি শব্দ 'নাও', 'লাবাতি', 'সানকি', 'কাউয়া' 'গাওয়ার', 'খোয়াব' শুধু বাক্য নির্মাণে নয়, ধ্বনি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কাজে লেগেছে।

লোকজীবন থেকে কবি যে শব্দগুলি আহরণ করেছেন সেগুলি কবিতার মূল ভাব ও বিষয়বস্তুর সাথে মিশে গিয়ে কাব্য-শরীরী হয়ে ওঠে এইভাবে-

৪. শিকার পাইলা খুলে দেখবে নেই, ভাত বা সালুন
কইরে হারামজাদা দেখুম আজকা তর হগল পুংটামি,
কোনখানে পাড়ো তুমি জবর সোনার আণ্ডা, কও মিছাখোর
বলেই টানবে লেপ, তারপর তাজ্জবের মতো
পেখম উদাম করে দেখবে এক বেশরম কাউয়ার গতর।
(আমিও রাস্তায়)

লোকজীবন থেকে আহৃত 'শিকার পাইলা', 'সালুন', 'হগল পুংটামি', 'আন্ডা', 'বেশরম', 'কাউয়ার গতর' শব্দগুলি কাব্য-কায়ার সঙ্গে সমীভূত হয়ে শিল্প গুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

৫. সাহস দেখনা মিয়া, শহরে আগুন দিতে আহে ঐ
বে-তমিজ, গাঁওয়ের পোলারা।
সাহস দেখনা মিয়া, বে-তমিজ বান্দির পুতেরা
মাইনসের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান ওড়ায়।
(আমিও রাস্তায়)

ভাষা ব্যবহারের প্রক্রিয়ায় 'মিয়া', 'বেতমিজ', 'পোলারা', 'বান্দির পুতেরা', 'মাইনসের লওয়ের মতো' শব্দ, পদ ও পদবন্ধগুলি কাব্য-কায়ার সঙ্গে মিশে রস সৃষ্টিতে পরিপূর্ণতা এনেছে।

গ্রামকেন্দ্রিক লোকজীবনে কৃষি-সভ্যতা নির্ভর অনেক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি আল মাহমুদের 'খড়ের গম্বুজ' কবিতায় -

৬. তাকে দেখে কিষানেরা অবাক সবাই
তাড়াতাড়ি নিড়ানি স্তুপাকার জঞ্জাল সরিয়ে
শষ্যের শিল্পীরা এসে আলের ওপরে
একগাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
সস্নেহে বলল, 'বসে যাও'।

'কিষাণ, 'নিড়ানি', 'আল' 'বিচালি' শব্দগুলি ভাব-প্রকাশের, ভাষাশৈলীর অবিভাজ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

'সোনালী কাবিন' কবিতায়-

৭. বাইরে দারুণ ঝড়ে নুয়ে পড়ে আনাজের ডাল
তস্করের হাত থেকে জেয়র কি পাওয়া যায় ত্বরা-
সে কানেট পরে আছে হয়ত বা চোরের ছিনাল।

শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি কতখানি দুঃসাহসিক তার প্রমাণ পাওয়া যায় জেয়র,

আনাজ, কানেট, ছিনাল শব্দাবলীর ব্যবহারে। এই ধরণের শব্দ চয়ন আল মাহমুদের অসংখ্য কবিতায় শিল্পিত রূপ লাভ করেছে।

'সোনালী কাবিন-১৪' কবিতায় কবির শব্দ ব্যবহার শুধু-সমৃদ্ধি লাভ করেনি, তাৎপর্যে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে -

'বৃষ্টির দোহাই বিবি তিলবর্ণ ধানের দোহাই
দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর
লাঙল জোয়াল কাস্তে, বায়ুভরা পালের দোহাই
হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোনো কবি করেনা কসুর।
কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান-নাপাক
নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা
রাতের নদীতে ভাসা পানিউড়ী পাখির ছতরে
শিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙে ছলছল।'

এখানে লোকভাষা নির্ভর 'দোহাই', 'হালাল', 'কসুর', 'খেলাপ', 'জবান-নাপাক', 'নাদান', 'নলা', 'পানিউড়ী', 'ছতর', 'কিসিম' শব্দগুলি বাংলার সংস্কৃতি-নির্ভর হয়েছে এবং কবির সংবেদনে ভাব-সংলগ্ন হয়ে উঠেছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আল মাহমুদের কবিতায় প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন-

১. চতুর্দিকে খনার বচনের মতো
টিপাটপ শব্দে সারাদিন জলধারা ঝরে।

('প্রকৃতি')

২. পুকুরের জল তরঙ্গের মতো টুপটাপ শব্দ।

(রবীন্দ্রনাথের বাড়ি)

৩. পাখি উড়ছে কোয়াক কোয়াক করে ডাকছে
একটি যাযাবর হাঁস।

('আদি সত্যের পাশে')

৪. মাটির কলসে জলভরে স্নান সেরে
ঘরে ফেরে সালিমের বউ তার সপসপে গায় ।

('তিতাস')

'টিপটিপ', 'টুপটাপ', 'কোয়াক কোয়াক', 'সপসপে'- এইসব ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিচিত্র ও বর্ণবন্ত লোকসমাজ থেকে সংগ্রহ করে কবি ঐতিহ্য সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন ।

একাধিক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারেও আল মাহমুদের অনেক কবিতা লোকজীবন-অন্বিত হয়ে ওঠে এইভাবে-

১. তার চোখে বিবমিষা । যেন মেঘনা পাড়ের রসিক জেলে যুবতীরা
ঠাট্টা করে তাকে সিদলের ঝাল-ভর্তা খাইয়ে দিয়েছে ।

(বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

২. কেন হাত খুঁজে ফেরে দ্বারের কীলক ।

(প্রহরান্তের পাশ ফেরা)

৩. শৈবালের দামে চঞ্চু ডুবিয়ে তুলে আনে আহার্য ।

('এক সুহাগিনী বোনের জন্য)

এখানে 'বিবমিষা', 'কীলক', 'চঞ্চু' শব্দত্রয় শুধু বাস্তববোধের দ্বারা নয়, অর্থ ও ভাবের দ্বারাও পূর্ণ ।

কবিতায় আবেগ কখনো হয় চড়া, কল্পনা কখনো হয় উদার, সংরাগ কখনো হয় তীব্র । শব্দ নির্বাচনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্যমুখী এবং বক্তব্যকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করার জন্য সুনির্বাচিত বিশেষণ ব্যবহার যথার্থ কবির কাব্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় । অভিব্যক্তির কারণেই কাব্যে বিশেষণ ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম । এক সময় জীবনের আভ্যন্তরীন রহস্য প্রকাশের প্রসঙ্গে অভিব্যক্তিবাদ এক শিল্প আন্দোলনের রূপ লাভ করেছিল । সে অন্য প্রসঙ্গ ।

কবি আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় বিশেষণ ব্যবহারের দ্বারা ভাবকে বৈশিষ্ট্যময় করে তোলেন । এ তাঁর ভাষারীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । অজস্র উদাহরণ থেকে মাত্র দুটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে -

১. শরমিন্দা হলে তুমি ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে
মুছে দেব আদ্যক্ষর রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন ।

('সোনালী কাবিন-২')

২. চাষির বিষয় নারী
উঠোনে ধানের কাছে নুয়ে থাকা
পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী ।

('কবির বিষয়')

'সজল চুম্বন', 'পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী' প্রভৃতি শব্দ বন্ধনে কবির কাব্য জগৎ অনুপম বৈচিত্র্যে সজ্জিত হয় ।

কবি আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় কখনো কখনো উপভাষার আশ্রয় নিয়েছেন । বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষা । মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, মালদহ, নদীয়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, শ্রীহট্ট, যশোর, নোয়াখালি ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা হল বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা । এগুলি বাক্যগঠন, শব্দ ব্যবহার, উচ্চারণ বিধি ইত্যাদির দ্বারা বিচিত্র হয়ে উঠেছে । বাংলার লোকসাহিত্যে এই আঞ্চলিক ভাষার সুপ্রচুর ব্যবহার রয়েছে । কবি আল মাহমুদ বাস্তব জীবন-চিত্র অঙ্কনে local colour ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তাঁর কবিতায় ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকভাষা ব্যবহার করেছেন বহুবার । উদাহরণ -

১. 'সাহস দেখোনা মিয়া, শহরে আগুন দিতে আহে ঐ
বেতমিজ গাঁওয়ের পোলারা ।'
২. 'দিল বাইন্ধ্যা পথঘাট, বাসগাড়ি, মোটর দোকান ।'
৩. 'গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুরুব্বির গায় ।'
৪. 'দেখুম আজকা তর হগল পুংটামি ।'
৫. 'বেতমিজ বান্দির পুতেরা
মাইনসের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান উড়ায় ।'

উপরের পংক্তিগুলো আল মাহমুদের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের 'আমিও রাস্তায়' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে । লোকাভিজ্ঞতাজাত এই বাক্যগুলি কবি তাঁর কাব্যে অত্যন্ত শিল্প-সচেতন মন নিয়ে ব্যবহার করেছেন । এবার তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত অলংকার নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে সেগুলি কিভাবে লোক-বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যে কাব্যময় হয়ে উঠেছে ।

উপমা অলংকারের ব্যবহার ঃ-

১. বাংলার আকাশ জুড়ে মালার মতো
উড়ে যাচ্ছে হাঁসেরা।

('এক সুহাসিনী বোনের জন্য'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

২. সদ্য দুইয়ে নেওয়া গাভীর মতো
হালকা মেজাজের বাংলাদেশ।

('অস্পষ্ট স্টেশন'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৩. বৌ-ঝিরা মাছের মতো ঝাঁক বেঁধে
আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

(তদেব)

৪. পাথর কুচির পাতার মতো তাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আনন।

(তদেব)

৫. যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে
গতির প্রবাহ হানে।

('তিতাস' / শ্রেষ্ঠ কবিতা')

৬. ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
আজও উবু হয়ে আছি।

('প্রকৃতি' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৭. চতুর্দিকে খনার বচনের মতো টিপ টিপ শব্দে
সারাদিন জলধারা ঝরে।

('প্রকৃতি' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৮. ইলিশের মৌসুমের মতো
হাওয়ায় হলুদ পাতা শব্দ করে ঝরে যায়।

('বাতাসের ফেনা' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৯. বুবুর স্নেহের মতো ডুবে যায়
ফুলতোলা পুরোনো বালিশ।

('বাতাসের ফেনা' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

১০. সাপের অঙ্গের মতো ভঙ্গি ধরে
টান মারে মিছিলে রাস্তায়।

('আমিও রাস্তায়' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

১১. পিঠার মতো হলুদমাখা চাঁদ।

('এক নদী' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

১২. এই তো সে। গোধূলিতে ঘর ফিরতি
রাখালের হাঁক-ডাকের মতো।

('অস্পষ্ট স্টেশন/ শ্রেষ্ঠ কবিতা)

১৩. দাঁড়িয়ে থাকা দেবদারুর মতো দেহ তার।

(তদেব)

১৪. কিষাণের ললাট রেখার মতো নদী।

('রাস্তা' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আল মাহমুদের অনেক কবিতায় অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ লক্ষগোচর ভাবে বর্তমান। লোকজীবনের বিভিন্ন উপাদানকে তিনি অনুপ্রাস অলংকারে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় শৈলীগত বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মতো। লোকজীবনের উপাদান নিয়ে সৃষ্ট অনুপ্রাসগুলি কিভাবে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টির আধার হয়েছে তা দেখানো যেতে পারে -

১. বাঙালি কৌমের কোল কল্লোলিত করো কলবতী।

('সোনালী কাবিন-২' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

২. জানত না যা বাৎসায়ন আর যত আর্যের যুবতী।

(তদেব)

৩. পূর্বপুরুষেরা ছিল পাট্টিকেরা পুরীর গৌরব।

('সোনালী কাবিন' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৪. শেষমেষ তোমার এ শুদ্ধতম শিল্প ভেসে যায় ।

('প্রেয়সী তোমাকে'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৫. উষ্ণমহাদেশে আজ ভস্ম তোমার কৈশোর ।

('প্রহান্তরের পাশফেরা'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের ব্যবহারেও আল মাহমুদের অনেক কবিতা সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে । লোকজীবন থেকে আহৃত বিভিন্ন উপাদানে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে ব্যবহার করে কবি সেগুলিকে কাব্য-কায়ার সঙ্গে অবিভাজ্য করে তুলেছেন । কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ-

১. সোনার সুতোয় রূপোর গিঁট মেরে
যেন বাংলাদেশকে দৃশ্যমান করে তুলেছে
এক তাঁতির মুখ ।

('বিজলি লাগা দশটি আঙ্গুল'/শ্রেষ্ঠ কবিতা')

২. বিচিত্র কাপড়ে বাঁধা ঘামে ভেজা উপচানো বুকে
বনের রহস্য কাঁপে যেন ।

('অরণ্যে ক্লান্তির দিন'/ শ্রেষ্ঠ কবিতা')

৩. সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে ।

('তিতাস'/ শ্রেষ্ঠ কবিতা'

৪. কার বউ তুমি, যেন পড়ন্ত বয়সী জাতা ।

('জলছবি'/ শ্রেষ্ঠ কবিতা'

৫. ফিরে যেতে সাধ জাগে
যেন ফিরে যাওয়ার পিপাসা ।

('ফেরার পিপাসা'/ শ্রেষ্ঠ কবিতা'

৬. চোখ যেন রাজা মহীপালের দীঘি

(আগস্ট স্টেশন'/ শ্রেষ্ঠ কবিতা'

৭. দমবন্ধ বাংলার গলা থেকে যেন এক ঢোক কান্না

('স্বরভঙ্গ'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

'তাঁতির মুখ', 'বিচিত্র কাপড়', 'নাও', 'বউ', 'মহীপালের দীঘি', 'বাংলা'-উৎপ্রেক্ষা অলংকারে ব্যবহৃত এ সবই লোকজীবন থেকে নেওয়া। এগুলি কবির লোকবীক্ষার সোনালী ফসল যেন।

রূপক অলংকার সৃষ্টির মাধ্যমে কবি আল মাহমুদের কাব্যশৈলী নির্মাণ একটা বিশেষ মাত্রা পায়। তার এই ধরণের অলংকারে রয়েছে লোকজীবনের নানা উপাদান। রূপকের শিল্প কুশল ব্যবহার কবির বক্তব্যের অনুসারী হয়েছে। রূপক অলংকারগুলি তাঁর কবিতায় কখনোই পৃথক বস্তু হয়ে থাকেনি, কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। যেমন-

১. সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।

('রাস্তা / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

২. সিক্ত নীল শাড়ির নিশেন।

(তদেব)

৩. একটি ম্লান দুঃখের করবী।

(তদেব)

৪. তারিক মিরের এক খড়ে ছাওয়া স্বপ্নের গহ্বরে।

('জলছবি/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কবি আল মাহমুদের পর এবার এপার-ওপার বাংলার বিশ শতকের অন্ত্যলগ্ন অন্যান্য কবিদের কাব্যশৈলী-প্রসঙ্গ উপস্থাপনার প্রাক্কালে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার বলে মনে করি। যথার্থ কবি যিনি, মেধা ও মননের জগৎ ভেদ করার মত কবিত্বশক্তি রাখেন তিনি। তাঁর কবিতা পাঠে পাঠকের চেতন-অবচেতন স্তরে আপনা থেকেই ভাবনালোক তৈরি হয়ে যায়। যথার্থ কবির কাব্য-ভাষা শুধু নয়, কাব্যের সমস্ত নান্দনিক দিকগুলোও পাঠকের মেধা-মননের অনবদ্য খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। শব্দের যথার্থ প্রয়োগে কবির কবিতায় যেমন ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ শব্দ চয়নে ও নির্মাণে কাব্য-ভাষায় আসে অর্থ-দ্যোতনা। সত্যিকারের সার্থক কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ তার শব্দের পরিবর্তনীয়তা। একটি শব্দ পাল্টে একই অর্থের অন্য শব্দ বসানো অসম্ভব। একটি সার্থক কবিতার ক্ষেত্রে

একটি মাত্র শব্দের পরিবর্তন কবিতাটিকেও পরিবর্তিত করবে, হয়ত তার বক্তব্যকে বিকৃত করবে। কবি একেবারে ঘরোয়া কথাবার্তায় ব্যবহৃত শব্দও কবিতায় ব্যবহার করে কাব্যের ব্যাপ্তি ঘটান। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এপার-ওপার বাংলার কবিরা তাঁদের বিভিন্ন কবিতায় যেসব দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলির অধিকাংশই বাস্তব এবং সুখপাঠ্য। কোনো কোনো কবি ইংরেজি শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়ে তাঁদের কাব্যের শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কারও কবিতায় উঠে এসেছে অনুভবময় বিশ্বাসের অনুসঙ্গ। কোনো কবির কবিতায় ব্যবহৃত অলংকার গুলো গভীর অনুভূতি সম্পন্ন, গন্ধ-স্পর্শযুক্ত ও চিত্রময়। কেউবা আবার অসাধারণ চিত্রকল্পের ব্যবহারে দেশিয় ঐতিহ্য-আধারিত বাংলার পারিপার্শ্বিক জগৎকে উপস্থাপিত করেছেন। এ সময়ের সার্থক কবিরা নানা ধরণের ছন্দ-নির্মাণেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এঁদের অনেকেই কবিতা রচনার শুরুতেই ছন্দকে জানার চেষ্টা করেছেন, ছন্দ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তাই এদের অনেকের কবিতায় দেখি, ছন্দের ভিতরে থাকতে থাকতে আরেক ছন্দে চলে যাচ্ছেন অনায়াসেই। কোনো কবি ছন্দের পিঠে সওয়ার হয়ে তাকে প্রকৃত কবিতার দিকে ধাবিত করার আসল কাজটি করেছেন। কিন্তু তাই বলে নিছক ছন্দকেই কবিতার শেষ কথা বলে এঁরা মনে করেননি।

কবির সামাজিক দায়বদ্ধতা যেমন আছে, তেমনি আছে শব্দ চয়নে ও তার যথার্থ বয়নের প্রতি দায়বদ্ধতা। কখনো কখনো কবি সামাজিক দায়মুক্তও হয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি শব্দ জগতের ক্ষেত্রে দায়মুক্ত হতে পারেন না কখনোই। কারণ শব্দ দিয়েই কবি প্লাবিত করতে পারেন আমাদের দুঃখ-ব্যথা, ক্রোধ-শিহরণ, আমাদের বেঁচে থাকা, না-থাকার প্রতিটি মুহূর্ত। এই শব্দই তাই ছন্দ-সহযোগে কবি-কল্পনায় শিল্পিত হয়ে ওঠে। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এপার-ওপার বাংলার কবিরা শব্দের যথার্থ ব্যবহার করে স্বপ্ন ও বাস্তবের মিশ্রণে নির্মাণ করেছেন তাঁদের কাব্যশৈলী।

কবিতায় থাকে আবেগ, কবিতায় থাকে ছন্দ। এই আবেগ হতে পারে নিরেট বক্তব্যময়। ছন্দের ব্যাকরণকে কবিতা ছুঁয়ে থাকবে ততক্ষণ যতক্ষণ শিল্পের মৃত্যু না ঘটে। ছন্দ ছাড়া কবিতা হয় ছন্নছাড়া। আর কবিতাই বলি কেন, ছন্দ ছাড়া কিছুই হয়না

জগৎ সংসারে। যা কবিতা নয়, তাতেও ছন্দ আছে, পূর্ণতাও আছে। মাত্রা গুছিয়ে, রীতি-প্রকরণ বেঁধে তৈরি হয় কবিতার ছন্দ। আবার ছন্দ-বিহীনতার ছন্দেও যে কবিতা দেখা যায়, এতো আর নতুন কথা নয়। আসলে ছন্দ একটি খাঁটি মাত্রাবোধ বা সংযম-যা নির্মাণকে সুন্দর করে। আর ছন্দ যখন দোলা দেয় তখন কবিতা আমাদের দোলায় বৈ কি।

কবিতার ছন্দের স্থান ছিল, আছে এবং থাকবে। ছন্দ ব্যতিরেকে কবিতা হয় না। কেউ যদি চিরাচরিত ছন্দের প্রবণতা উপেক্ষা করে একান্ত গদ্য ফর্মেও কবিতা লিখতে যান, সেখানেও অন্য রকম একটা ছন্দ-যাকে বলা হয় ভাবছন্দ, তার সক্রিয়তা তিনি অনুভব করবেন। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, যেকোনো ভাবেই কবিতায় ছন্দের প্রভাব ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ছন্দ মানে শুধু অন্ত মিল নয়, বলা বাহুল্য। 'ছন্দ' কথাটা ব্যাপক অর্থবাহী। এ বিষয়ে আজ আর দ্বিমত নেই যে কবিতার চলনেও একটা অন্তর্নিহিত ছন্দ থাকে; নইলে কবিতা পড়া যায় না। কিন্তু এই আড়ালে থাকা ছন্দটা ধরতে গেলে মূল যে ছন্দ প্রকরণ, সেটা জানাও জরুরী। আজকের উত্তীর্ণ গদ্য কবিতা, তা-ও ছন্দ-ছাড়া নয়। ছন্দের ক্ষেত্রে, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এপার-ওপার বাংলার অনেক কবিই স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। এই সময়ের অনেক কবির কবিতায় রয়েছে ছন্দের চাকচিক্য। তাঁদের পরিচ্ছন্ন ছন্দরীতি কবিতার বক্তব্যকে আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে তোলে। আলোচ্য যুগেও ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষা , নানা কলা-কৌশলের প্রয়োগ ঘটেছে। ছন্দে এ সময়ে এসেছে গতিশীলতা। গদ্য ছন্দ রচনায় অনেক কবিই ছিলেন পটু। বাক্‌রীতি ও ছন্দরীতির মিশ্রণে এই সময়ের ছন্দ হয়েছে কলা মণ্ডিত। মিলে, অন্তর্লীন মিলে, অনুপ্রাসে, পুনরুক্তিতে, ধ্বনির সূক্ষতা ও বৈচিত্র্যে অনেক কবির কবিতা পাঠককে আকর্ষণ করেছিল, এখনও করে। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের একাধিক কবি ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করে গভীর কথা হালকা চালে বলেছেন। ভাষা বিন্যাসের মধ্যেই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা উজ্জীবিত করেছেন গদ্য কবিতার ছন্দ-স্রোত, ক্রিয়াপদের অবস্থানের ওপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ রেখে এই সময়ের কবিরা কখনো কর্তার আগে বা পরে বসিয়ে অথবা ক্রিয়াপদের ব্যবহার না করেই গদ্য ছন্দের জাল বিস্তার করেছেন। ছন্দের টানকে অব্যাহত রাখার জন্য তাঁরা হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের দিকে যেমন খেয়াল রেখেছেন

তেমনি বাক্যকে ছোট-ছোট, কাটা-কাটা সংক্ষিপ্ত কথকী-ঢঙ বা কথা বলার রীতির কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। আসলে এই কথাতো জনজীবনের কথা, লোকমুখ নিঃসৃত বলেই এগুলি লোকজীবনের অত্যন্ত কাছাকাছি। এই ধরণের অসংখ্য ছন্দোময় পংক্তির ব্যবহার রয়েছে এযুগের বাংলা কবিতায়। ছন্দ-ঋদ্ধ এইসব কবিতায় কথকীরীতি আর চলতি শব্দ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

কবিতার আংগিকের দিকে সচেতন ছিলেন অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা। বাস্তব জীবনের অনুভূতি বা সংবেদনার প্রতিরূপন অত্যন্ত সুন্দর, স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল হয়েছে এই সময়ের অনেক কবির কবিতায়। এঁদের অনেকেরই প্রেরণাস্থল রবীন্দ্রনাথ। কেউ আবার যজুর্বেদের গদ্য মন্ত্র থেকে গদ্য ছন্দের সাবলীল চর্চায় সফল হয়েছেন, কেউ কেউ ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতো পাশ্চাত্য কবিদের কাছেও কবিতা রচনার ঋণ স্বীকার করেছেন। আলোচ্য সময়ের কবিরা অবিরাম গদ্য কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তাঁদের ভাবনার সংঘর্ষ-সংযোগ 'উপস্থাপিত' করেছেন পাঠকের সামনে। পুরোনো কথাও এসময় নতুন ভাবে-ভাষায় তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে কাব্যের সামগ্রী হয়েছে।

[৩]

কবিতায় লোকভাষা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার কাব্যশৈলীর ব্যাপার। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় এই কাব্যশৈলীর ব্যাপারে আমাদের লক্ষ নিবদ্ধ রাখতে হয়-

১. কাব্যের আত্মভূত সৌন্দর্যের কারণে কবিরা কী জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন।
২. *কোন্ ধরণের শব্দ কবি পছন্দ করেন।*
৩. কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ইত্যাদির ব্যবহার কিভাবে করেন।
৪. কবির ব্যবহৃত বাক্যগুলি ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কতখানি সার্থক।
৫. বাক্যে কি জাতীয় প্রসাদগুণ (উপমা, অলংকার, ছন্দ, শব্দধ্বনি, ইত্যাদি) বর্তমান।
৬. স্তবক-বন্ধন রীতির ক্ষেত্রে কোন্ নিয়মকে কবি প্রাধান্য দিচ্ছেন।
৭. কাব্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলি সামগ্রিক রূপের দীপ্তিতে কতখানি উজ্জল ।

শৈলীর দ্বারাই কবিকে সবার মাঝখান থেকে চিনে নেওয়া যায়। এই শৈলী হল

স্রষ্টার প্রকাশ ভঙ্গির স্বাতন্ত্র । প্রতিভার স্বরূপই হল একবারে নিজস্ব প্রকাশ । প্রত্যেক বড় কবিরই থাকে নিজস্ব রচনাশৈলী- যার দ্বারা তিনি সম্মানীয় স্থান পান ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এপার -ওপার বাংলার কবিরা তাঁদের কবিতায় অনেক সময় শব্দে শব্দে স্থির চিত্র অংকন করেছেন । চিত্রপ্রিয় এই সব কবিরা Landscape বা প্রকৃতি-বিষয়ক বিশেষ ধরণের অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লোকচেতনাকে স্পর্শ করেছেন। অন্ত্যলগ্নবিশ শতকের কবিরা বৈজ্ঞানিক দুনিয়ার বিষয় নিয়েও ল্যাণ্ডস্কেপ রচনা করেছেন । Landscape -এর অনেক বিষয়ের মধ্যে অন্যতম গোধূলি ,সায়ংকাল ,নিশীথরাত্রি ,নির্জন গ্রাম ইত্যাদি । অনেক কবি এইসব ক্ষেত্রে আলোর নানা রং ও মূর্তি ব্যবহার করে ‘লুমিনিজম্ ’-এর বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন । রোদ,জ্যোৎস্না ,ভোর, সকাল, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সন্ধ্যারাত্রি ইত্যাদির ছবি তাঁরা ফুটিয়েছেন লোকঐতিহ্যের অভিজ্ঞতায় ।

এঁদের মধ্যে অনেক কবি শুধু রূপদক্ষ নন,শিল্পকর্মের অসাধারণ নৈপুণ্যে বিরল শিল্পী ।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের যে অভ্যুদয় হয়েছিল ঔপন্যাসিকদের উদার নৈতিক মানবতাবাদের প্রেরণায়, অচিরেই তা কবিতায় প্রভাব বিস্তার করেছিল । সুকান্ত ভট্টাচার্য , সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে এপার-ওপার বাংলার অসংখ্য কবি বাস্তববাদের কাঠামোয় আদর্শবাদ প্রচার করেছেন তাঁদের কবিতায় । শিল্পসম্মত ভাববোধক চিহ্ন ব্যবহার করে এসময়ের অনেক কবিই কবিতায় প্রতীক সৃষ্টি করেছেন । এই সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত লোকঐতিহ্য কবির মনে ও মননে আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় ভাষারূপ লাভ করেছেন ।

নানা লোকউপাদানে এই সময়ের কবিতা ব্যাপ্ততর হয়েছে । Lore বা ঐহিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুরান কাহিনি ও ইতিহাসের ঘটনাবলী স্মরণ করে কবিরা লোকজীবনের সাথে সংযোগ রক্ষা করেছেন । লোকবীক্ষার যে কাব্যিক ফসল তা থেকে কিছু লোকজ শব্দ এখানে চয়ন করা যেতে পারে -

ছেঁড়া কাঁথা, মাটির বাড়ি, গোবর নিকানো ঘর, চৈত্রে হাওয়া, সতীনের চোখ, সংক্রান্তির সরা ভাসানো, বিপত্তারিনীর ব্রত, শান্তিজল, কোমল ধানের চারা, কিষাণ-কিষাণী, খনার বচন, জলঢোড়া সাপ, পিতলের ঘড়া, হুঁকো, ইলিশের মরসুম, বৃষ্টিহীন

মাটি, করোগেট টিনের বাড়ি, মাটির দেয়াল, গাঁয়ের অক্ষয় বট, চড়ুইএর বাসা, কলসি, গরুর গোয়াল, ফুলতোলা পুরানো বালিশ, শিকার পাইলা, সালুন, গাঁওয়ের পোলা, তিতাস, কাউতলী রেলব্রীজ, চাষার হাল-বলদের গন্ধ, লাউয়ের মাচা, ভাদুগান, শুটকির গন্ধ, সন্ধ্যার গোয়াল, ধবলীর ফেরা, হাটের নাও, দখিনা বাতাস, কবর, আঁঠালো লতায় বাঁধা জোনক পোকা, পানের বাটা, বোরখা, রূপোর মাদুলি, তোরঙ্গ, কাশের ফুল, বিল, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, মাটির কলস, ঝুড়িতে সবজি, চাকমা কিশোরী, রক, ফসলের ক্ষেত, কাকতাড়ুয়া, কুয়ো, পচাপাতা, গোবর, ঘুঁটে, শাকভাত, কুলুঙ্গি, লম্ফতে আলো, কাঁথা, সেলাইয়ের সূঁচ, চৌকাঠ, নাকফুল, নাকের নোলক, উনুন, নিশিন্দা নিংড়ানো কেশতেল, পাথরকুচি পাতা, হিজলতলা, গাভীর বাট, শৈবালের দাম, শামুকের মাংস, কাদাখোঁচা পাখি, খেজুরের রস, মাটির সানকি, খাল-বিল, ডোবা-নালা, হাওর, খোলাম কুচি, গাঁয়ের মেয়ে, মেটে ঘরের আঙিনা, জোনাকি, নারিকেলের সারি, ছোট নৌকো, কাদা, বাইম মাছ, পচা পাট, মশার ঝাঁক, পানাপুকুর, ঘর ফিরতি রাখাল, মহীপালের দিঘি, কালোরুই, শালিক, গো-পালক, গাভী ও বাছুর, চাষি, মাটি, কালচে সবুজ, সীমাহীন মাঠ, ঘর্মাক্ত যুবতী, গঞ্জের হাট, নদীর পাড়, যাযাবর হাঁস, পালের দড়ি-দড়া, সিদলের ঝালভর্তা, তিলবর্ণ ধান, লাঙল-জোয়াল, কাস্তে, পানিউড়ি পাখি, নুয়েপড়া আনাজের ডাল, পিঠা, নরম কলাপাতা, নিড়ানি, আল, বিচালি, মারিফতি, কুহলি পাখি, পানের বরজ, কুরুলিয়ার কই, মুনসি বাড়ি, বাংলাদেশের ইলিশ, মেঘনার তীর, নারিকেল সারি, ছোট নৌকা, জাল, দড়ি, ম্লান জোনাকি, মধুমতী গাভির বাট, ঢেকির গম্ভীর শব্দ, ব্যাঙের ছাতা, আঙিনায় ঝোলানো কুমড়ো, শিশির বিন্দু, একতারা হাতে বাউল, দুর্গোচ্ছব, জল-কাদা, আগাছা ইত্যাদি ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এপার-ওপার বাংলার কবিরা কাব্যের সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধকে 'অস্তিত্বের সম্বন্ধ' হিসেবেই গুরুত্ব দিয়েছেন । ফলে কলকাতার আঞ্চলিক ভাষাকে তাঁরা কাব্যভাষা তথা জনসংযোগের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেও বাস্তববাদের সাধনায় তাতে 'লোকাল কালার' দিয়ে রস সৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছেন । তাঁরা এমন অনেক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন যেগুলি শুধু কাব্যের কায়া নির্মাণে উল্লেখযোগ্য

সমৃদ্ধি দান করেনি, ভাবের বৈচিত্রময়তাকেও স্পষ্ট করেছে । বাক্য ও বাক্যাংশের অন্তর্গত এই শব্দগুলি একেবারে লোকজ । একই সঙ্গে কবিরা ব্যবহার করেছেন 'কক্‌নি'। তাঁদের বিশ্বাস, কাব্যভাব প্রাণোত্তাপে জীবন্ত এবং ব্যঞ্জনায় সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে কক্‌নির ব্যবহারে । এই লোকজ শব্দগুলিকে অনেক কবি বিশেষায়িত করতে গিয়ে সুনির্বাচিত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন । ফলে বক্তব্য হয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সুনিয়ন্ত্রিত । গাবগন্ধী নদী,নগ্ন হাঁটু , ঘর্মাক্তমুখ ,ভূমিহীন কৃষক, চাক্‌মা কিশোরীর উপচানো বুক, মায়াবী নদী,অলৌকিক যৌবন, সিক্ত নীল শাড়ী,নীলাম্বরী জল,সজল চুম্বন ,দমবন্ধ বাংলাদেশ, পূর্ণস্তনী নারী প্রভৃতি অসংখ্য বিশেষণ বাক্যবন্ধ ও অর্থবোধকে শুধু সমৃদ্ধ করে নি, লোকজীবনের নানা অনুসঙ্গকে কাব্যশরীরী করে তুলেছে । এ সময়ের কোনো কবি তাঁর অনুভূতি দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার কোনো কবি সৃষ্টি করেছেন চিন্তা দিয়ে তাঁর জগৎ । অনুভূতিশীল কবির মধ্যে পেয়েছি রোমান্টিক বিলাস, চিন্তাশীল কবির মধ্যে পেয়েছি সচেতন পরিশ্রমের স্পষ্টতা - যা তাঁর কাব্যসৃষ্টির অবলম্বন । এঁদের কাছে মুখ্য উপাদান শব্দ, অপ্রচলিত শব্দ ও আভিধানিক শব্দ- দুটোই ।

কাব্য-সংসার থেকে অলংকার আজও নির্বাসিত হয়নি । কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, কাব্যের শরীর আছে, আর সেই শরীরকে নানাভাবে সাজিয়ে কাব্য-লালিত্য বৃদ্ধির জন্য কবিরা অলংকার ব্যবহার করেন । আলোক প্রার্থী ব্যক্তি যেমন দীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, ঠিক তেমনি কাব্যর স্বার্থে কবিকেও অলংকৃত কথাবস্তু নির্মাণ করতে হয় । দীপ যেমন আলোকের মাধ্যম অলংকারও তেমনি রসের মাধ্যম । কাব্যে প্রযুক্ত অলংকার কাব্যাত্মার সঙ্গে অভিন্ন নাহলে তা শিল্পিত রূপ লাভ করেনা ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিদের কাব্যে অলংকার ব্যবহার প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি মনে পড়ল । অসংখ্য লোক-উপাদানকে কবিরা শব্দের বাঁধনে বাঁধতে গিয়ে নানা অলংকারের নক্সায় সেগুলিকে মনোহারী করে তুলেছেন । আল মাহমুদ রূপক অলংকার সৃষ্টিতে শিল্পনির্ভর ভাষায় লোক-অভিজ্ঞতাকে এইভাবে ব্যবহার করেন-

১.　ভুরুতে ক্লান্তির নুন / গলে পড়ে গালের দুপাশে ।

(কবিতা ঃ 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

২.　কিষানের ললাট রেখার মতো নদী
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য
লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্ত নীল শাড়ীর নিশেন
এক নির্জন বাড়ির উঠোনে ফুটে আছে
একটি ম্লান দুঃখের করবী ।

(কবিতাঃ 'রাস্তা' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৩.　ফিরতে হবে ঘড়া নিয়ে ভাদুগড় গাঁর
তারিক মিরের এক খড়ে ছাওয়া স্বপ্নের গহ্বরে ।

(কবিতাঃ 'জলছবি' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৪.　তুমি আমার তিতাস কালো জলের ধারা
তুমি আমার কালো শালুক চিরচেনা ।
কালো মাটির কালো পুতুল তুমি আমার
তুমি আমার অসুখ ঘরে বাসক পাতা
তুমি আমার বর্তমানের সিক্ত ছাতা
তুমি আমার গ্রীষ্ম দিনের ঠাণ্ডা হাওয়া ।

('বেহায়া সুর' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সাঙ্গ, নিরঙ্গ, মালা রূপকের সংযোগে কবিতার বুনটকে কতটা মজবুত করা যায় এ যুগের কবিরা তার বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁদের অসংখ্য কবিতায় ।

শব্দের উপযুক্ত বিন্যাসে, ধ্বনির অন্তর্লীন দোলায় এ যুগের অনেক কবিতায় চিত্রকল্প পাঠকের মানস-পটে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে । যেমন -

১. ভুরুতে ক্লান্তির নুন / গলে পড়ে গালের দুপাশে।

(কবিতা ঃ 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

২. কিষানের ললাট রেখার মতো নদী
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য
লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্ত নীল শাড়ীর নিশেন
এক নির্জন বাড়ির উঠোনে ফুটে আছে
একটি ম্লান দুঃখের করবী।

(কবিতাঃ 'রাস্তা' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৩. ফিরতে হবে ঘড়া নিয়ে ভাদুগড় গাঁর
তারিক মিরের এক খড়ে ছাওয়া স্বপ্নের গহ্বরে।

(কবিতাঃ 'জলছবি' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৪. তুমি আমার তিতাস কালো জলের ধারা
তুমি আমার কালো শালুক চিরচেনা।
কালো মাটির কালো পুতুল তুমি আমার
তুমি আমার অসুখ ঘরে বাসক পাতা
তুমি আমার বর্তমানের সিক্ত ছাতা
তুমি আমার গ্রীষ্ম দিনের ঠাণ্ডা হাওয়া।

('বেহায়া সুর' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সাঙ্গ, নিরঙ্গ, মালা রূপকের সংযোগে কবিতার বুনটকে কতটা মজবুত করা যায় এ যুগের কবিরা তার বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁদের অসংখ্য কবিতায়।

শব্দের উপযুক্ত বিন্যাসে, ধ্বনির অন্তর্লীন দোলায় এ যুগের অনেক কবিতায় চিত্রকল্প পাঠকের মানস-পটে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যেমন -

১. বালিহাঁসেরা দল বেঁধে নামল মেদীর হাওরে
শামুকের মাংসের পাশে জমে থাকা
নির্মল বারির জন্য তৃষার্ত
শৈবালের দামে চঞ্চু ডুবিয়ে তুলে আহার্য ।

(আল মাহমুদ-'এক সুহাসিনী বোনের জন্য' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

২. দূরে গোপদের গ্রাম । প্রজ্জ্বলিত উনুনে এখন
চাষিদের অন্ন উথলায় । ঘরে ঘরে দুহিত গোধনে
পরিতৃপ্ত জনপথ ।
এই গ্রামে আছে এক গোপালক
সদাহাস্য চাষি
ধনিয়া কিষাণ বলে ডাকে লোকে,
গোপী তার নারী ।
বহুপুত্রে ফলবতী মনোরমা, পরিতৃপ্ত মাতা
গাভী ও বাছুর নিয়ে সুখী পুত্রগণ ।

(আল মাহমুদ-'ভারতবর্ষ'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

চিত্রগুণসমৃদ্ধ এই পংক্তিগুলি শুধু কবিতার দেহকেই সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেনি, গ্রামের রূপময় প্রকৃতিকে ও জীবনধারকে যেন রঙে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে অপূর্ব করে উপস্থাপিত করেছে । লোকজীবনের এই উপাদানগুলি কবির হৃদয়ানুভূতিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে । যে রূপ দেখে কবি মোহিত হয়েছেন, পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন তার ধারা সুদূর অতীত থেকে আজও নিরবধি বয়ে চলেছে । লোকজীবনের এই বিশেষ চিত্র প্রতীয়ত করে তুলতে পেরেছে ।

কবি নির্মল হালদারের কবিতায় লোকসংস্কৃতি নির্ভর চিত্রকল্পের ব্যাপারে গ্রামের কথা এসে যায় । ফাগুন-চোতের পাতাহীন অশথ গাছ ও তার সংলগ্ন মন্দির চিত্রের আভাস এনে দেয়-

'মন্দির সংলগ্ন অশথ গাছ
ফাগুন-চোতের দিন একটিও পাতা নেই
হঠাৎ দেখি একটি ডালে দুটি টিয়া পাখি
উড়তে উড়তে এখানে এসে একটু বিশ্রাম
নিস্পত্র ডালপালা কেঁপে কেঁপে উঠছে
উথালি পাতালি হাওয়ায়।'

('আগমন'/ শ্রেষ্ঠ কবিতা/পৃষ্ঠা-১২১)

উপরের আভাসিত চিত্রটিতে, প্রতীকী দ্যোতনা রয়েছে দুটি টিয়াপাখির 'একটু বিশ্রাম' শব্দবন্ধে। আর একটি উদাহরণ -

আমাদের মহল্লায় রামায়ণ গান হয়
রাত আটটা বাজতেই নানা বয়সের
পুরুষ ও মহিলা এসে জড়ো হয়,
ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও কিচির মিচির করে
তারপর খোল বাজে মৃদঙ্গ বাজে
হারমোনিয়াম বাজিয়ে
কথক ঠাকুর শুরু করেন গান
তারপরেই কোনো ছেলে বা মেয়ে
চন্দনের বাটি নিয়ে সবার কাছে যায়
টিপ পরিয়ে দেয়।

এতো শুধু চিত্রকল্প নয়, লোক-চেতনার সঙ্গে কবি-মননের প্রকাশ্য যোগে শিল্প সৃষ্টি। লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান এখানে লোকচেতনার অংশ-সংলগ্ন হয়ে অমোঘ হয়েছে, চিত্র-তথ্য হয়ে উঠেছে চিত্রকল্প।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায় মৃত্তিকাসম্ভব জনজীবন থেকে আহরণ করেছেন তাঁর চিত্রকল্পের নানা উপাদান -

১. বৃষ্টি ভরা মেঘগুলি জমে ছিল নদীর ওপারে
এপারে গম্ভীর ছিল বসতির মধ্যে ভাঙ্গা চার্চ
মাঝখানে ভাসমান নৌকো নিয়ে মগ্ন ছিল জলে।

('পিকনিক'/শ্রেষ্ঠ কবিতা/পৃঃ১২০)

২. লিচু গাছের ঝুলন্ত সব ডালপালাতে
জড়িয়ে আছে খেলার শিশু পলকা হাতে
বোঁটার থেকে নিচ্ছে ছিঁড়ে রসের মুঠোর
মতন লিচুগুচ্ছ, এখন বিকেল বেলা।

('লিচু চোর'/শ্রেষ্ঠ কবিতা/পৃঃ-২৩১)

৩. নদীর কূলের কাছে বালি, নদীর
ভিতরে অন্ধকার, তাতে আলোর মতো মাছ
সোনালি রূপালি
দুপাড়ে পাথর, পাথরের কনিষ্ঠ নুড়ি নিয়ে
চলতে চলতে নদী পড়েছে সমুদ্রে।

('আদিপুরাণ'/শ্রেষ্ঠ কবিতা'/পৃঃ১৮৮)

চিত্রকল্প গুলিতে জীবন-নির্লিপ্তির পরিবর্তে আছে জীবন-সংসক্তি। জীবন-সংরাগ জনিত যে অনুভব তা অবারিত হয়েছে কাব্যের গতিপথে। এই চিত্রকল্প গুলিতে আছে নিসর্গ ও জীবনের প্রতি কবির মায়া।

বুদ্ধদেব বসুর প্রায় সব কবিতাই জীবন নিয়ে লেখা। বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র জীবন, জীবনের বহু দৃষ্টিপাত, জীবনকে দেখবার বহু দৃষ্টিকোন- এসব নিয়েই রচিত হয় তাঁর কবিতার চিত্রকল্প। একটি কবিতার শিরোনাম 'এলা-দি'। এই পৃথিবী, এই জীবন, এই বেঁচে থাকার কণা সর্বক্ষণ মানুষকে গ্রাস করে বলেই 'ঠিকে ঝি হরিমতি' অতীত থেকে বর্তমানের পরিক্রমায় রিক্ততায়, সঞ্চয়হীনতায় না-পুরুষ, না-নারী-

'মনে পড়ে আমাদের ঠিকে ঝি হরিমতিকে
সকাল থেকে সন্ধ্যা যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে

বাসন মাজে, যার মুখের মধ্যে দুটো মাত্র দাঁত
আছে এখন, আর সে দুটো ঝুলে পড়া আর
নোংরা হলুদ। তার মুখ যেন মেয়েরও নয়
পুরুষেরও নয়। খুব কম কথা বলে সে, শুধু
পিঠ বাঁকিয়ে কাজ করে যায়।'

('এলা-দি'/শ্রেষ্ঠ কবিতা'/পৃঃ ১৪৭)

সঙ্গতভাবেই একথা উঠবে - সব কবিরইতো অবলম্বন জীবন। অবশ্যই তাই। কিন্তু জীবনকে কবিরা অনুভব করেন বিভিন্ন দিক থেকে। তাই মানস প্রবণতার কোনো-না কোনো ঝোঁক একজন কবিকে প্রায়শই চিহ্নিত করে দেয় বিশেষ কোনো একটি অভিধায়। কোনো কবিকে বলা হয় আশাবাদী, কেউ নৈরাশ্যবাদী। কেউ নাগরিক কবি, কেউ লোকজীবনের কবি। কেউ আত্মমগ্ন, কেউ সমাজমনস্ক।

কিন্তু কবি মনীন্দ্রগুপ্তের বেলায় একথা খাটে না। তাঁর কবিতাকে কোনো অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না। তাঁর কাছে সমগ্র জীবন একটা বিষয়-বাঁচার বিষয় এবং শিল্পের বিষয়। এই সমগ্র জীবন বিষয়টিকে টুকরো টুকরো করে বহু কবিতায় জীবন বিম্বিত, সব কবিতা নিয়ে জীবন প্রবাহিত। সে জন্যেই তাঁর কবিতায় বোধহয় কোনো 'বাদ' বা 'তন্ত্র'কে স্পষ্ট করে চেনা যাবেনা। জীবনের যেহেতু কোনো 'বাদ' বা 'তন্ত্র' নেই তাই কবি যখন তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, বলা বাহুল্য, সেগুলিতে থাকে জীবনের বিচিত্রতা, জীবনের বহু দৃষ্টিপাত, জীবনকে দেখবার দৃষ্টিকোন-

'.... বাড়ির চারদিকে খোলা চার বৃহৎ দরজা
বিকেল পশ্চিমের দিকে
দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো লম্বা লম্বা গাছ,
তাদের পিছনে লাল আকাশ
গভীর রাত্রে দক্ষিণের দরজায় ধূসর কালো

আকাশে চন্দ্রমা।'

('সর্বতো ভদ্র'/শ্রেষ্ঠ কবিতা/পৃঃ ১৩২)

এই চিত্রকল্পটি কবির জীবন-সংসক্তির ফসল। জীবন আছে বলেই চাঁদের মায়ায় কবিতা লেখা হয়ে আসছে বহুকাল থেকেই। জীবনের রূপ সন্ধানের দিকে কবির গতি বলেই তিনি নৈসর্গিক চিত্রকে ভাবনার বিষয় করে তুলতে পারেন। আর একটি চিত্রকল্প-

'হাওয়ায় উসকো খুসকো চুল গরিব গাঁ খানা
বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন-
কোথাও ছায়ায় একঝাঁক আমরুল শাক,
কোথাও শুকিয়ে ওঠা জলার ধারে
এক ফালি কলমি দাম,
কোথাও গর্তজলে আধঘুমন্ত একটা ল্যাটার বাচ্চা।'

('সূর্যাস্তের কিংবদন্তি'/শ্রেষ্ঠ কবিতা / পৃঃ-৩৪)

এখানে গ্রাম-বাংলার নানা উপাদান বিষয়ে তাঁর আগ্রহই শুধু নেই, লোক-জীবন পরিক্রমা-পথে জীবনের রূপ সন্ধানের দিকেই তাঁর গতি। চিত্রকল্পটি নিসর্গের নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান হয়ে জীবনের সংকেত দ্যোতিত করে।

মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় লোকজ শব্দের প্রচুর ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও সেগুলো সোজা টানটান হয়ে ওঠে দাঁড়ায়। অসংখ্য লোকজ শব্দ - থুয়ে, খইস্যা, গতরখাকী, বিয়োবে, মাইস্যা, মনিষ্যি, রাহে, ফুডা, জইম্যা, তাঁর কবিতাকে লোক-জীবন নির্ভর করে তুলেছে। তিনি যেমন বাংলার লোকজীবনের নিবিড় রূপ এঁকেছেন তাঁর কবিতায়, তেমনি লোকজ অসংখ্য শব্দকে কাব্যে অবস্থান দিয়েছেন সম্পূর্ণ আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে। যে বাংলাদেশ অতি কাছ থেকেও অনেক কবি দেখতে পাননি, সেই বাংলাদেশকেই মোহাম্মদ রফিক দেখেছেন পরম আত্মীয়তায়। আসলে সোনার নয়, অভাগী বাংলাদেশই তো সত্যিকারের বাংলাদেশ। সূক্ষ্মবোধ আর অনুভূতি দিয়ে গড়া কবি চৈতন্যে রয়েছে গাঢ় জীবনবোধ। তাঁর জীবনের স্বপ্নে অপ্রাপ্তি থাকলেও হতাশা নেই। তাঁর দৃপ্ত শাব্দিক উচ্চারণের অর্থ খুঁজে পেতে তিনি আমাদের জানিয়ে দেন যে

এদেশের অন্ধকারের ইতিহাসও বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতিরই অংশ বিশেষ।

লোকজ শব্দ ব্যবহারে মোহাম্মদ রফিক যে চিত্রকল্প রচনা করেন তাতে জীবন বাস্তবতার নিবিড় ছোঁয়া রয়েছে। তাঁর 'কালাপানি' কাব্যগ্রন্থের 'বিসর্জন' কবিতায় একটি চিত্রকল্পে জীবনের বর্ণনা সঙ্কটে ও প্রেমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এইভাবে-

চৈত্রের রোদ্দুরে পোড়া মাটি, প্রথম বৃষ্টির
শিহরণ, সোঁদা ঘ্রাণ, কর্ষণে উন্মুখ দীর্ঘদিন,
শৈশবে বন্ধুর মুখ, নুনে ধরা ঘরের দেয়ালে
অজস্র অস্পষ্ট ছবি, কড়িকাঠে অসুস্থ তক্ষক,
পরিত্যক্ত ভিটে আগলে ক্ষীরদার বুড়ি মা, কাসেম
কাসেমের বাঁজা বউ, ভাঙ্গা শ্লেট, মাস্টার মশায়,
রাজনীতি, বাবার খদ্দর- জেল, সাম্যবাদ, ভোরে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে, ভুঁই চাঁপা,
কাঁঠালের পিঁড়ি পেতে মুড়ি, কার্তিকের শেষাশেষি
বকুল ফুলের ঘ্রাণে জলের অতলে এক দিদি।'

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে বাংলাদেশের কবিরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন নয়মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এই রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাঁর আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির ভেতরেই নিহিত ছিল বাংলাদেশের অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিতার সক্রিয়তার বিষয়টি। আর তাই এ সময় বাংলাদেশের কবিতায় যে কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল, জীবন চৈতন্যের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন বহুমুখী বৈচিত্রে উদ্ভাসিত। তাঁরা বাংলাদেশের কবিতায় ফিরিয়ে আনলেন দায়বদ্ধ কবিতার ধারা। পূর্বে মাতৃ ঐতিহ্যের টানে বাংলা কবিতার মর্মমূল প্রবেশ করেছিল দেশ চেতনার শেকড়ে। কিন্তু স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা দেশ চেতনার সঙ্গে নির্মাণ করলেন মৃত্তিকা সংলগ্ন কবিতা। সূচনাকালীন সততার কারণেই হয়ত তাঁরা মৃত্তিকাসম্ভব কাব্য ভাবনায় উদীপ্ত হওয়ার অবকাশ পেলেন। এ সময়ের যেসব কবি স্বাতন্ত্র্যিক পরিচয়ে নিজেদের মেলে ধরেছিলেন তাঁদের

মধ্যে দাউদ হায়দর, ময়ূখ চৌধুরী, আবিদ আনোয়ার, নাসির আহমেদ, সৈয়দ হায়দার, আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার, রুদ্র মুহম্মদ, শহিদুল্লাহ, কামাল চৌধুরী, ফারুক মাহমুদ, মাসুদুজ্জামান, আবু করিম, হাসান হাফিজ, জাহিদ হায়দার, আবু হাসান শাহরিয়ার প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে যে কাব্যগ্রন্থটি বাংলাদেশের কবিতায় নবতর মাত্রা সংযোজন করেছিল এবং কিছুটা হলেও পাঠকমহল চমকিত হয়েছিল, সেটি কবি দাউদ হায়দরের 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'। অসহায়-নিপীড়িত-বঞ্চিত মধ্যবিত্ত বাঙালির হাহাকার ধ্বনি ছিল এই কাব্যের মূল উপজীব্য। একই সঙ্গে বৃত্তবাসী কবির রোমান্টিক ব্যক্তিপ্রেম দেশপ্রেমের প্রেক্ষাপটে একই মাত্রায় দ্বিমুখী আবেগ ও উত্তাপ সঞ্চারিত করেছিল। সাধারণ মানুষের যে স্নায়ব বোধ- যা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে স্বেদরক্তের প্রত্যক্ষতা দিয়ে ছুঁয়ে আছে তাকেই কবি দাউদ হায়দার যথাযথ শব্দ, ছবি ও চিত্রকল্পে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর কবিতায় নানা অনুষঙ্গে বার বার ফিরে এসেছে শত্রু, যৌবন, চাল, টাকা, জন্ম, পাপ প্রভৃতি শব্দগুলি-

শত্রুর দেখা নেই; অথচ আমারি শত্রু
আমি-
জ্বলন্ত যৌবনে ছুটি ফ্যামিলি প্ল্যানিং কোথায়
কোথায় ডাক্তার কম্পাউন্ডার
যারা আমায় অপারেশন করবে ?
পুরুষত্ব বিলিয়ে ভাবি কুড়ি টাকায়
এক সের চালও একদিনের অন্যান্য
সামান্য দ্রব্যাদি মিলবে তো ?

('জন্মই আমার আজন্ম পাপ' / জন্মই আমার আজন্ম পাপ)

স্বাধীনতার কিছু দিনের মধ্যেই সংঘটিত সেই রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অনিশ্চয়তা আর অর্থনৈতিক দীনতা দাউদ হায়দারের কবিতায় উঠে এসেছিল জনচেতনা ও শ্রেণীচেতনার পটভূমির ভেতরেই। অথচ কবিতার জন্যই নির্বাসিত এই কবির

কবিতার ভাষায় সারল্য এবং বক্তব্যের ঋজুতা তাঁকে জনপ্রিয় করেছে। পরবর্তীকালে কবির প্রবাসবাস এবং বাংলাদেশের কবিতার ক্রমাগত উত্তরণের পথে কবি দাউদ হায়দরের লেখনী-শক্তির ধারবাহিক ছেদ, বাংলাদেশের অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিতার প্রতিষ্ঠানিক স্থিতির ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ব্যত্যয় ঘটিয়েছে। এ সময়ের কবিতায় দৈশিক বাস্তবতার প্রতিফলন জীবন ও শিকড়-সংলগ্ন হয়ে উঠেছিল। বিধায় প্রসাধনী ও চাকচিক্যময় ধ্রুপদী বাক্য বিন্যাসের স্থলে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য বয়ানের রীতি অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। ফলে এসময়পর্বের কবিরা বিষয়ের স্বচ্ছতার ওপর মনোযোগী হন অধিকমাত্রায়। তাই এসময়ের কবিতায় যে বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায় সেগুলি হল লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, প্রবাদ-প্রবচনের শিল্পমন্ডিত ব্যবহার, প্রতীকী ও পরাবাস্তব চিত্রকলা, ইতিহাসবোধ, ব্যক্তিবোধ, স্থানের ব্যাপ্তি, কালের রহস্য, জীবনের বিস্ময়, স্মৃতি-বিস্মৃতির ইঙ্গিত, ইতিবাচক জীবন-অন্বেষা, বর্নিলচিত্রল বিষয়।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে ওপার বাংলার কবিতায় লোক-জীবন ঐতিহ্যের প্রতি কবিদের এক অদ্ভুত টান লক্ষ্য করা যায়। শবাদ সজ্জায় কবিতা যে কদখানি অলংকৃত হতে পারে, চিত্রধর্মিতা এবং সংগীতময়তা কবির বক্তব্যকে যে কতখানি মায়াঘন-আবেশমধুর করে তুলতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে এ যুগের কবি জিয়া হায়দারের কবিতায়। তাঁর 'একতারাতে কান্না' কাব্যের 'লখিন্দর' কবিতায় পাই সেই প্রেম যা লোককাব্য মনসামঙ্গলের কল্প জগতের সাথে অন্বিত-

> বেহুলা সুন্দর প্রেম, তবে বুঝি নিয়তি প্রসন্ন আমাদের;
> দ্যাখো ওই চিকন আলোর রেখা স্ফীত হতে স্ফীততর ক্রমে।
> এসো, দেখি উন্মুক্ত পৃথিবী আর মৌমাছির খেলা,
> আমরাও বসন্ত বাউরি হই; এসো, প্রেম,
> বেহুলা আমার।

এখানে ভাষা ব্যবহারে কথোপকথনের মেজাজটি ফুটে উঠেছে। বেহুলার উদ্দেশ্যে কবির বলার ভঙ্গিটি ভাব-সংযোজনার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কাল পর্বেও কবি লিখতে পারেন শাশ্বত বাস্তব লোকজীবনের কথা -

আমার কয়েক টুকরো ইচ্ছে-
ফুল, বৃষ্টি, পায়রা, ধানশীষ, গান
কৌটোর ঢাকনা খুলে বেরোতে পারেনি কোনোদিন,
তোরা বড়ো অলুক্ষণে
পয়মন্ত বউমার হাতে পড়ে দেখিস একদিন
ইচ্ছেগুলো বেরোবেই ঠিক রং বেরঙের প্রজাপতি হয়ে ।

('কৌটোর ইচ্ছেগুলো'/কৌটোর ইচ্ছেগুলো)

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিতায় ওপার বাংলার কবিরা চিত্রকল্পের বিস্ময়কর ব্যবহার দেখিয়েছেন । এ সময়ের অন্যতম প্রাতিস্বিক কবি আবিদ আনোয়ার চিত্রকল্পের ব্যবহারকে কবিতার শৈলীর ক্ষেত্রে অন্যতম উপকরণ বলে মনে করেন । ভাষা-ব্যবহার, উপমা-চিত্রকল্প রচনা, আঙ্গিক ও রূপরীতির বিন্যাসের ক্ষেত্রে আবিদ আনোয়ার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন । কবির এই অনন্যপরতা তাঁর প্রায় সব কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে । আবিদের কবিতা পাঠকের চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং কবিও আরো একবার পাঠক সমাজকে নতুন আঙ্গিকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হন । কবির 'স্বৈরিণীর ঘরসংসার' কাব্যে এই চিত্রকল্পের ব্যবহার অতি মাত্রায় প্রোজ্জ্বল এবং পাঠক এই কাব্যে আবিষ্কার করেন ভাস্কর্য সুলভ নিপুণ শিল্পকর্ম । অর্থাৎ কবিতায় স্বোপার্জিত পাঠক অবলোকন করেন এমনসব রহস্যময় চিত্রবিশ্ব, যেখানে ভাস্কর্যের মতো সংহত হতে থাকে অপূর্ব সব চিত্রকল্প-

তোমাকে মানাতো প্রত্নবেদীতে পঞ্চলিকায়
গোপী চন্দনে তিলক পরালে বৈষ্ণব কবি;
কোলাহলময় বিশ-শতকের শেষপাদে কেন এলে ?
নষ্ট কালের এই প্রেমিক
কী দিয়ে তোমার বন্দনা করি
নারী কীর্তনে ব্যবহৃত সব উপমা দিয়েছি ফেলে !

(আবিদ আনোয়ার, :প্রত্নরমণী', স্বৈরিণীর ঘরসংসার)

আবিদ আনোয়ার প্রতীকী ও পরাবাস্তব চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে তুলে আনেন সমকালীন ও শাশ্বত জীবন-বাস্তবকে। আবেগ ও মননের সমন্বিত পরিচর্যার ভেতরেও তাঁর কবিতা ছিল সমকাল নির্ভর। ভাব-ভাষা-ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতির সুষ্ঠু সমন্বয়ে শিল্পরূপ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেমন যত্নবান, তেমনি কবিতার চিত্রকল্পের শোভা ও ব্যঞ্জনা অনুধাবনে সমর্থ হন।

কবি ফররুখ আহমদ যে প্রক্রিয়ায় তাঁর কবিতা শিল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন, সেটি কবির নিজস্ব। এই নিজস্বতা এসেছে বাক্‌প্রতিমায় অসাধারণ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্প-নির্মাণের মৌলিকত্বে ও নিপুণতায়। ফররুফ আহমদ কবিতার শুদ্ধতায় বিশ্বাসী। একজন পুরোমাত্রায় শিল্পসিদ্ধ কবি তিনি। কবিতা নামক শিল্পের শুদ্ধতা রক্ষায় তিনি আপোসহীন। যুগপরম্পরায় বাংলা কবিতার আদি রূপ-ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই তিনি নিয়ত আধুনিক। তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য থাকলেও শব্দ-প্রয়োগে ও ছন্দ কুশলতায় তিনি অননুকরণীয়। নিসর্গের মাধুরী মোহময়ী ভাষায় ব্যক্ত হয় তাঁর কবিতায়-

> 'গোধূলি তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
> অস্থির বিদ্যুত তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ,
> সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক চঞ্চল;
> অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ'
>
> ('বন্দরে সন্ধ্যা'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতার আকাশে একজন মেধাবী কবির স্বীকৃতি আদায় করে নেন কবি ময়ূখ চৌধুরী। তাঁর প্রথম কাব্য 'কালো বরফের প্রতিবেশী'তে তাঁর মেধা ও শাণিত মননের সুস্পষ্ট জানান দেন তিনি। ওজস্বী এই কবির কাব্য সমূহে রোমান্টিক মনের স্পর্শ আমরা পাই। একই সঙ্গে বাঙালির চিরচেনা 'বালিহাঁসের অঞ্চল' বাংলাদেশ ও তার লোকজীবন কবিতার মৌল অংশ হয়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন, তেমনি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কও অভেদ্য, সেই মনোজগতে মানুষকে ঘিরে যে জীবনচক্র তার প্রত্যক্ষতা এবং অনুভবতা ময়ূখ চৌধুরীর কাব্যে

আবিদ আনোয়ার প্রতীকী ও পরাবাস্তব চিত্রকল্পের ভেতর দিয়ে তুলে আনেন সমকালীন ও শাশ্বত জীবন-বাস্তবকে। আবেগ ও মননের সমন্বিত পরিচর্যার ভেতরেও তাঁর কবিতা ছিল সমকাল নির্ভর। ভাব-ভাষা-ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতির সুষ্ঠু সমন্বয়ে শিল্পরূপ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেমন যত্নবান, তেমনি কবিতার চিত্রকল্পের শোভা ও ব্যঞ্জনা অনুধাবনে সমর্থ হন।

কবি ফররুখ আহমদ যে প্রক্রিয়ায় তাঁর কবিতা শিল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন, সেটি কবির নিজস্ব। এই নিজস্বতা এসেছে বাকপ্রতিমায় অসাধারণ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্প-নির্মাণের মৌলিকত্বে ও নিপুণতায়। ফররুফ আহমদ কবিতার শুদ্ধতায় বিশ্বাসী। একজন পুরোমাত্রায় শিল্পসিদ্ধ কবি তিনি। কবিতা নামক শিল্পের শুদ্ধতা রক্ষায় তিনি আপোসহীন। যুগপরম্পরায় বাংলা কবিতার আদি রূপ-ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই তিনি নিয়ত আধুনিক। তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য থাকলেও শব্দ-প্রয়োগে ও ছন্দ কুশলতায় তিনি অননুকরণীয়। নিসর্গের মাধুরী মোহময়ী ভাষায় ব্যক্ত হয় তাঁর কবিতায়-

'গোধূলি তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
অস্থির বিদ্যুত তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ,
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক চঞ্চল;
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ'

('বন্দরে সন্ধ্যা'/শ্রেষ্ঠ কবিতা)

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতার আকাশে একজন মেধাবী কবির স্বীকৃতি আদায় করে নেন কবি ময়ূখ চৌধুরী। তাঁর প্রথম কাব্য 'কালো বরফের প্রতিবেশী'তে তাঁর মেধা ও শাণিত মননের সুস্পষ্ট জানান দেন তিনি। ওজস্বী এই কবির কাব্য সমূহে রোমান্টিক মনের স্পর্শ আমরা পাই। একই সঙ্গে বাঙালির চিরচেনা 'বালিহাসের অঞ্চল' বাংলাদেশ ও তার লোকজীবন কবিতার মৌল অংশ হয়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন, তেমনি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কও অভেদ্য, সেই মনোজগতে মানুষকে ঘিরে যে জীবনচক্র তার প্রত্যক্ষতা এবং অনুভবতা ময়ূখ চৌধুরীর কাব্যে

নিজস্ব চরিত্র নিয়ে উপস্থিত ঃ

আমরা ক'জন মানুষ
পাখির বিয়েতে গিয়েছিলাম ।
একজোড়া বালিহাঁস আমাদের
দাওয়াত করেছিলো ।
পাখির বিয়ের কাজ যথারীতি সম্পন্ন
হওয়ার পর
খাওয়া-দাওয়ার পালা ।
আমরা বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই
ভোজনপর্ব শেষ করেছিলাম
বালিহাঁসের ঝলসানো মাংস দিয়ে ।

('পাখির বিয়েতে', আমার আসতে একটু
দেরি হতে পারে) ।

সানাউল হকের কবিতায় রয়েছে এক ধরণের অবিশ্বাস্য সরলতা । তাঁর কবিতায় যেমন রয়েছে প্রকৃতির শ্যামলিমা, তেমনি আছে দেশপ্রেম । তাঁর কবিতা শিল্পের দাবিকে পূরণ করে সর্বাংশে এবং সেই নিয়মের মধ্যেই তিনি সৃষ্টি করেন স্বকীয় রীতি । সানাউল হকের কবিতায় দেশপ্রেম, নিসর্গ প্রেম ও দেহীপ্রেম মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় । নিসর্গ বর্ণনায় বাংলার লোকজীবন প্রিয়ার ছবিকে জাগিয়ে দিয়ে কবির চোখে মায়াঞ্জন পরালেও বাস্তব সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়-

শীতল পাটির মত ঠিক আমাদের প্রিয়ানদী
রূপোলী কেশের গুচ্ছ সুচিক্কন ঢেউ ঢেউ যার
তনুপূর্ণা কতো স্নান উন্মীলিত ভাঁজে ভাঁজে তার
ডুব দাও গহীন বুকের স্বাদ পেতে চাও যদি ।'

(তিতাস-পূর্বরাগ)

সানাউল কহ্ ১৯৭১ থেকে যে কবিতাগুলি লেখেন তাতে সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়েছিল । প্রকৃতি প্রেমিক এই কবি মানব দরদী ছিলেন । ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর একাডেমি পুরস্কার পাওয়ার মূলেও বোধহয় আপন ভূখণ্ড ও মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধ । তাঁর গ্রামের ছবি যখন উৎপ্রেক্ষা অলংকারের সজ্জায় পরিবেশিত হয় তখন তা মনকে নাড়া দেয়,-

'নক্সীকাটা সরঙাই নাও তরতর নিয়ে যাত্রী দল
গ্রাম ছেড়ে গঞ্জঘাটে কবুতর যেন অবিকল ।'
('কত নৌকা আহা')[২]

ওপার বাংলার টাঙ্গাইলের কবি সাযযাদ কাদির । ১৯৭০-এ তিনি লেখেন 'যথেচ্ছ ধ্রুপদ' কাব্যগ্রন্থ্ । সত্তরের এই বলিষ্ট কবির কাব্য স্বভাবে গীতলতা ও রোমান্টিকতা একটি প্রধান বিষয়ে পরিণত হলেও তাঁর কাব্যভাবনা ও কাব্যশৈলী পরিশীলিত আর চেতনায় ঋদ্ধ । তিনি একজন অস্তিবাদী রোমান্টিক কবি । জীবন ঘনিষ্টতা, মোহাচ্ছন্নতা, অস্তিত্ব অন্বেষা, বাস্তবতা এবং প্রেম ও রোমান্টিকতার বিচিত্রতায় সত্তরের যে কজন কবি বাংলাদেশের কবিতাকে উৎকর্ষের দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম কবি সাযযাদ কাদির - কবিতা নামক শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ এক কবিসত্তা । 'যথেচ্ছ ধ্রুপদ' কাব্যের 'শত্রু শত্রু' কবিতায় স্বীয় অনুভব ও অনুযোগ তিনি প্রকাশ করেছেন একোক্তির ঢঙে কোনো উদ্দীষ্ট ব্যক্তির কাছে -

'পাতা বাহারের কাছে দুঃস্বপ্নের আলো, যেন তার
মউমাছি ফিরে গ্যাছে, রোদরঙা মাছি, কোনোদিন
ঝলমলে উৎসবে একখন্ড ছায়া ফেলে দেবে;
'দ্যাখো দ্যাখো কি সুন্দর হরিণ ও চিতা অর্থময় ।

এখানে 'পাতাবাহার', 'মৌমাছি', 'রোদরঙা মাছি', 'হরিণ', 'ছায়া' রোমান্টিক অনুভবে ঋদ্ধ, নিসর্গের বর্ণনায় নির্বাধ, প্রতীক ব্যবহারে অনন্য ।

ওপার বাংলার কবি রফিক আজাদ অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে লেখেন 'কণ্ঠে তুলে আনতে চাই' কাব্যগ্রন্থ্ । ১৯৭১-এ লেখা এই কাব্যে রয়েছে সেই উপলব্ধি যা মানবের

শাশ্বত অনুভবে আন্তরিক। কবি যখন বলেন, 'মাটির শানকি-ভর্তি ভাত চাই'- তখন তাঁর মনের গভীরে যে লোকচেতনা প্রচ্ছন্ন থাকে তা কবির কাব্যশৈলীকে নিয়ন্ত্রিত করে। 'অন্তরঙ্গে সবুজ সংসার' কবিতায় লোকজীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি কবি ও পাঠকের মধ্যে অদৃশ্য সেতু রচনা করে এইভাবে-

'দ্বার খোলো, প্রতিশ্রুত হে প্রিয় দরোজা
শৈশবের পরিত্যক্ত ভো ভো মাঠ থেকে, ধুলো পায়ে
এই দ্যাখো কুড়িয়ে এনেছি আমি হারানো বেলুন-
স্মৃতির সাহিত্য সম্পদে- দয়া করে দ্বার খোলো।

শাশ্বত অনুভবের রাজ্যে বিচরণ করতে করতে কবির অবাঙমানসগোচর উপলব্ধিও লৌকিক বোধ ও বৃত্তিতে ভিন্নতর মাত্রা পায়।

কামাল চৌধুরীর কবিতায় ব্যক্তিমানুষ আছে, আছে তাদের দৈনন্দিনতা। এই দৈনন্দিনতার ভেতরে যাপিত জীবনেরই শিল্পরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। কবি তাঁর সৃষ্টিশীল হাতে উপমা ও চিত্রকল্পের আটপৌর অচলায়তনকে ভেঙে দেন বলেই তাঁর কবিতা সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ মুখভাষার ভেতর দিয়ে হয়ে ওঠে গীতময়ঃ

আবার জাগব আমি এই দেশে যেখানে বেড়েছি
যেখানে শিখেছি প্রেম অপরূপ বালিকা নদীতে
যেখানে পথের ধুলো জননীর পবিত্র পাদুকা
যেখানে সবুজ পাতা সন্তানের হাসি মুখরিত
পাখি জীবনের শেষে এই দুঃখ লোকালয়ে এসে
মানুষ খুঁজব আমি-পথে পথে শান্তি কবুতর।

('ভ্রমণ কাহিনী'/এই মেঘ বিদ্যুতে ভরা)

দ্রোহের কিংবা প্রতিবাদের কবি হিশেবে মেনে নিয়েও বলতে পারি, কামাল চৌধুরীর কাব্য ভাষায় রয়েছে এক লিরিক্যাল দ্যোতনা, যা তাঁর রোমান্টিক কবি মনের পরিচয় বহন করে। তাঁর কবিতার মেজাজ ও নির্মাণশৈলী তাঁকে করেছে স্বতন্ত্র। কামালের কবিতায় একাধারে নস্টালজিয়া, প্রকৃতি অনুসন্ধান, প্রেম বিরহ, ইতিহাস-ঐহিহ্য চেতনা,

ক্ষোভ-ঘৃণা-বিদ্রোহ এ সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক বিচিত্র অনুভবের আস্বাদ মেলে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় ধ্বংস আর সৃষ্টিশীলতার যে নির্মাণশৈলী, তা যুগপৎভাবে কামাল চৌধুরীর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। শিল্পিত ও গতিময় কাব্য ভাষার কারণে তাঁর কাব্য-বৃক্ষের শাখায় শাখায় জেগে ওঠে পাতা, জন্ম নেয় ফুল-ফল। মানুষের সাথে কবির গভীর অন্বয়বোধ, লোকচেতনা ও লোক-অভিজ্ঞতায় কবির কাব্য সৃষ্টি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। লোকজীবন বীক্ষা তাঁর কাব্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে বার বার।

ফিরে আসি এপার বাংলায়। 'কবিতার দায়, কবিতার মুক্তি' গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় কবি অরুণ সেন একবার ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম এই দশকের কবিতা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত তবু 'কী নিয়ে কবিতা লিখছেন', 'কেন লিখেছেন', 'কার কথা বলছেন'- এসব প্রশ্ন মাঝে মাঝে উঠত। কিন্তু ষাটের দশকে দেখা গেল, সাম্যবাদীর কাছাকাছি থাকা চলে, আবার নানা রকম মুহূর্তবাদী, নৈরাজ্যবাদী, কিমিতিবাদী ইত্যাদি ছদ্ম-দার্শনিকতায় গা ধুয়ে সব দায় অস্বীকার করাও চলে। সত্তরের দশকে, যতটুকু বুঝেছি, এই নান্দনিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটা হাওয়াতেই নেই-এসময়ের কবিদের কাছে প্রায় প্রত্নতত্ত্বের সামিল। এই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিদের মধ্যে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত একজন। এই কবির কবিতায় 'নান্দনিক দায়বদ্ধতা নেই' ভাবতে কষ্ট হয়। নান্দনিক দায়বদ্ধতাই যদি কবিতায় না থাকে, কবির কাছে যদি সেসব 'প্রত্নতত্ত্বের সামিল' হয়, তাহলে তাঁর রচনা তো কবিতাই হয়ে উঠতে পারে না। আসলে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কাব্যশৈলীতে একটা নতুন রকমের ভাঙাগড়ার কাজ চলছিল। বিশেষ করে 'ইমেজ'-এর ক্ষেত্রে তিনি শব্দ গঠন রীতিতে মৌখিক ভঙ্গিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। 'নির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থের 'উতঙ্ক' কবিতায় প্রণবেন্দু যখন লেখেন- 'বোনো বীজ, উতঙ্ক, বীজ বোনো' হাওয়া বলে। আর কোলাহলে / যেন কোনও কিছু শোনা যায় না / শুধু আয়না ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়'-তখন মিথ আর ইমেজ একাকার হয়ে যায় না, দুয়ের অবস্থান থাকে দুজায়গায়। উতঙ্ক যে কাহিনির সঙ্গে যুক্ত তা হল একান্তভাবেই Traditional story

তাই সে 'An imaginary person, not real' কিন্তু Image এর ব্যবহারে এই 'হাজার বছর' আগের উতঙ্ক দ্বান্দ্বিক ব্যাপ্তি লাভ করে। 'কোলাহল' আর 'আয়না ভাঙ্গা'র সঙ্গে উতঙ্ক আমাদের দিয়ে যায় কবোষ্ণ স্পর্শ। কবি নিজেই বলেছিলেন, 'আমার কবিতা বিষয়ে পাঠক মহলে দুটো ধারণা আছে। এক, মগ্ন অন্তর্মুখী আর সাম্প্রতিক কবিতা এ থেকে আলাদা -অনেকাংশে সমাজমুখী। 'Poetry is the social act of a solitary person' সমাজবোধ বা জীবনবোধ যদি কবিতায় অনুভূত না হয় তাহলে তা ব্যর্থ। একজন বিচ্ছিন্ন মানুষ হাত বাড়িয়ে থাকে সবার সাথে মেলামেশার জন্যে। সুতরাং আমাকে পলায়নবাদী কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই।'[৪] প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার ভাষাগত বৈশিষ্ট্যটি হল গঠনরীতিতে মৌখিক ভঙ্গির প্রবণতা। সেই কারণেই তিনি এমন অনেক শব্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেন যে গুলিতে লোকভাষার বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন-

১. যদি না ঘুমিয়ে পড়ি, তাই জেগে থাকি।

২. রাত নিশুতের মেঘ।

৩. এখন সবাই সুস্থ ওষুধ বিষুদ খেয়ে।

৪. দু'জন বেঈমানি করেছে কেন ?

৫. অমুকদার কথা ভাবতে হলে তমুকদাকে ...।

প্রথম তিনটি কবিতার পংক্তিতে রয়েছে কবির 'ভোরের ভাবনা' ও শেষ দুটি পংক্তি 'দুজন মেয়ে' কবিতা থেকে নেওয়া। এখানে 'ঘুমিয়ে পড়ি', 'জেগে থাকি', 'রাত নিশুতে', 'ওষুধ বিষুদ', 'বেঈমানি', 'অমুকদা-তমুকদা' শব্দগুলির ব্যবহারে লোকভিজ্ঞতার অতি স্পষ্ট ও স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে। 'আশ্বিন' কবিতায় যে চিত্রকল্প-

'চৈত্র রজনীর হাতে পড়েছিল ফুল আর চন্দনের মালা,
আশ্বিনেও তাই। শুধু ফুলগুলি আলাদা আলাদা।

-তা লোকচেতনার উৎস থেকে মানব চেতনার মহার্ণবে যেন মিলিত হতে চায়-

'মানুষ বাসবে ভালো, যেভাবে সবাই ভালবাসে'

('আশ্বিন', বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা, সুবল সামন্ত / পৃঃ ৪৩)

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা শুরু হয় অত্যন্ত নিরুদ্বেগভাবে। কোনো চমক নেই কোথাও, কিন্তু একটু একটু করে কবিতার ভিতরে ঢুকলে মনে হয় এক গাঢ় জীবনের মধ্যে এসে পড়ছি। ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, চেতন-অবচেতন সমস্ত কিছুর মধ্যে এক অনিবার্য জীবন প্রত্যক্ষ করতে থাকেন তিনি। তাই কবি যখন বলেন, 'আমাকে পলায়নবাদী কেউ বলতে পারবে না' তখন তাতে সত্যের মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়।

প্রণবেন্দু তাঁর একাধিক কবিতায় যে প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন সেটি 'লণ্ঠন'। অরুণাংশু ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, 'প্রণবেন্দু সম্পর্কে একথাটা জোর দিয়ে বলা যায় যে কবিতা ও জীবন তাঁর কাছে প্রায় অভিন্ন। ...... শেষ প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত প্রণবেন্দুর মতন কবি প্রায় কোনও রকম স্বীকৃতি পাননি। একজন যথার্থ কবির ক্রমাগত এই অপ্রাপ্তি শেষ পর্যন্ত তাঁকে বেশ কিছুটা উদাসীন ও মোহমুক্ত করে তোলে। ফলত সব কিছু থেকে বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে যেন তিনি নিজেকে দেখতে থাকেন এবং তা একটা লণ্ঠনের সাহায্যে।[৫]

লোকজীবনের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে 'লণ্ঠন' একটি। প্রণবেন্দুর কবিতায় 'লণ্ঠন' একটি অদ্বিতীয় প্রতীক। যেমন-

১. 'লণ্ঠন' উপুড় হয়ে পড়ে আছে, উঠোন আঁধার / কাছে আসতে দিই।'

২. 'হঠাৎ লণ্ঠন জ্বলে।'

৩. 'হঠাৎ লণ্ঠন নিবে যায়।'

৪. নিঃশব্দ পোকার মিছিল নড়ে ওঠে লণ্ঠনের কাছে।'

এই লণ্ঠন সম্পর্কে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'লণ্ঠন বললেই একটা মৃদু আলো, তার পাশে আবার একটা অন্ধকারে। পুরোপুরি আলোতেও থাকি না এবং আলো ছায়ার টানপোড়েনেই তৈরি হয় আমাদের জীবন, আমাদের কবিতা, সবকিছু।'[৬] এই সবকিছু বা সমগ্রতার এক মন্ত্রগাঢ় সংহতিতে প্রণবেন্দুর কবিতাজগৎটি আভাসিত।

কবিরুল ইসলাম অসুখী শৈশবকে ভুলবার জন্য কবিতা লেখেননি। লেখেননি অভিভাবকদের উৎসাহে অথবা যুদ্ধে অশান্ত সময়, নৈঃসঙ্গে কিংবা অন্যের কবিতা পড়ে

অনুপ্রাণিত হয়ে। তিনি লিখেছেন ভিতরের তৃষ্ণায়। তাঁর কবিতায় শব্দই আসল। কবিতার অন্তর্গূঢ় অবয়ব উন্মোচনে একান্ত নিজস্ব ঘরানার শব্দসুষমা ও ছন্দসুষমার আশ্চর্য মেলবন্ধনে জেগে ওঠা আস্বাদই তাঁর কাব্য সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ বিন্দু। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর শব্দ ব্যবহারে আমরা আকর্ষিত হইনা, সম্মোহিত হই। শব্দের সাহায্যে তিনি যে ছন্দোবন্ধ বাক্য নির্মাণ করেন তাতে খন্ড খন্ড দৃশ্য, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত উচ্চারণ শৈলী, বিস্ময়, জীবন সংরাগ আন্তরিক হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় আমরা পাই প্রাণের পূর্ণতা। তিনি তাঁর কবিতায় ধ্বনির মাধুর্য, সাংগীতিক গুণ, প্রতীকের আলো-আঁধার কোনো দিনই বর্জন করেননি। কবিরুলের অনুভব, উপলব্ধি উপস্থিত হয়েছে প্রতিটি শব্দে। এই শব্দ দিয়েই তিনি শুধু কাব্য-কায়া নির্মাণ করেননি, কবিতাকে করে তুলেছেন সংগীত মুখর। তাঁর অসংখ্য কবিতায় লোকজীবনের প্রতি ভালোবাসার আকুতি যেন 'এক নিঃসীম সুবাতাস।' যে শব্দ-শক্তি দিয়ে কবি ঐতিহ্যের কথা বলেন, মাটির কথা বলেন, জীবনের বহমানতার কথা বলেন, সেই শব্দ সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি-

'অন্তরীক্ষে শব্দ ঝুলে থাকে
          নিষিদ্ধ ফলের মতো
আমি সেই শব্দাবলি ছুঁতে চাই
          ছুঁয়ে-ছেনে
          শব্দে শব্দে আপ্রাণ পুতুল নয়
          প্রতিমা বানাবো
শব্দে শব্দে শব্দের অতীত
          মাটির মহিমা
          গান হবে
আমি সেই শব্দের ভেতরে
শিকড় চালাবো।'৮

কবির কাছে শব্দ হল অর্থ ভাববোধক চিহ্ন। তাই তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দ, বিশেষ কোনো ভাবকে ব্যক্ত করে বলেই প্রতীকী মাত্রায় চিহ্নিত হয়ে যায়। তাঁর

ব্যবহৃত শব্দগুলো বাক্-সংহতির মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনার অপার বিস্তার ঘটায়। তাই শব্দের শিল্প সম্মত ব্যবহার কবিরুলের পরিশীলিত প্রজ্ঞার ধ্যানমগ্ন সাধনা। কবি যখন বলেন -

'যা কিছু কবিতা, সব, সবই ভালোবাসা
আমরা সবাই এই বটবৃক্ষের আড়ালে
আমাদের প্রাণের প্রসন্ন প্রতিমাকে
শিরোধার্য করি-'[১৮]

প্রতিটি শব্দ-প্রতীকের মাঝে বিশেষ কয়েকটি শব্দ, যেমন-'বটবৃক্ষ', 'প্রতিমা', সংকেতময় আবেদন সৃষ্টি করে। এগুলো সান্ধ্যময় বা কুহেলি আচ্ছন্ন নয়, জীবন দিয়ে গড়া, অভিজ্ঞতা-অনুভূতির প্রেক্ষিতে কবির নিজস্ব সংবেদ। এই শব্দ দিয়েই কবি লোকজীবনের অসংখ্য উপাদানকে তুলে আনেন তাঁর কবিতায়-

১. 'ধান পোতা হয়ে গেছে / ক্ষেতে জল কৃষাণ-কৃষাণী।'
('দিনে-দিনে বাড়ে' ঃ বিদায় কোন্নগর)

২. না খোকা, বলতে নেই 'যাচ্ছি', বল্ 'আসি'।
('কোথাও যাচ্ছিনা, শুধু ফেরা / কাব্যসমগ্র)

৩. 'ভোরের দিকে আজানের মত জেগে ওঠে পাখিরা'
('যাত্রা' ঃ বিদায় কোন্নগর)

৪. 'চড়ুই ফুড়ুৎ পাখায় উড়ে গেলো'।
('যাও পাখি বলো তারে ঃ বিদায় কোন্নগর)

৫. 'বালকের হাতে খড়ি বর্ণ পরিচয় / এই শুরু।'
('এই শুরু, এইভাবে শুরু' ঃ বিকল্প বাতাস)

৬. 'যতদিন যাচ্ছে ঠেকে শিখি /দুঃসময়ে
কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে না।'
('হাত' ঃ বিকল্প বাতাস)

কবিরুল ইসলাম দু'ধরণের প্রতীক ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে (১) প্রথাগত (Conventional) (২) ব্যক্তিগত (Personal), 'ভূমিকম্প', 'স্টেশন' 'বিসর্জনের বাজনা',

'অনন্ত আহ্বান', 'গাছ'-এ সবই তাঁর কবিতায় এসেছে প্রথাগত প্রতীক হয়ে। কিন্তু কবি যখন বলেন, 'মুখোশের মোহন আড়ালে / রুটি খায় তপস্বী বিড়াল'- তখন তা হয় কবির একান্ত নিজস্ব শব্দমূর্তি - যা ভাবের সঠিক অনুষঙ্গে সমীকৃত হয়। কবির উপমা ব্যবহার কিভাবে তাঁর কবি-চেতনাকে বিস্তার করে তার একটি উদাহরণ-

'অন্তরীক্ষে শব্দ ঝুলে থাকে / নিষিদ্ধ ফলের মতো।'

এখানে যে ছবি কবিরুল আঁকতে চান তা শুধু বোধে উদীপ্ত নয়, প্রাণশক্তিতে সবুজ-সতেজ।

লোকজীবনের এই কবি বিশেষণ ব্যবহারেও লোক-অবস্থান থেকে সরে আসেন নি। 'সূর্যকরেজ্জ্বল ইচ্ছা', 'আশ্চর্য আমি', 'অপূর্ণ ইচ্ছা', 'নিষিদ্ধ ফল', 'আকণ্ঠ রোদ্দুর', 'ইচ্ছুক চড়ুই' 'উন্মোচিত রোদ্দুর' বাচনিক প্রক্রিয়ার মিশেলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

কবিরুল ইসলাম শব্দকে সঠিকভাবে জীবন ও জগতের 'আন্তসম্পর্কের শ্বাস প্রশ্বাসের কাছাকাছি নিয়ে যান। 'একটি সঠিক শব্দ একটি অনুষঙ্গে যে ছবির জন্ম দেয় তার কোনো বিকল্প হতে পারে না। যেহেতু শব্দ কবির একমাত্র সম্বল আর এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবারও কেউ নেই, তাই তাঁর লেখার জমি তাঁকে নিজেই কর্ষণ করতে হবে। জলে বাতাসে বাঁচিয়ে নিজের মত করেই তাঁকে ফুল-ফল সাজিয়ে দিতে হবে পাঠকের কাছে। শব্দ সকলের, অন্তর্গত ধ্বনিটির আয়োজনে তাঁকেই যেতে হবে, যাতে শব্দ মূর্ত হয়। মিত কথন কবির কাছে একটা আয়ূধের মত। খুব শানাতে হয় সে অস্ত্র, বলার চেয়ে না বলাকে বেশি করে দেখাতে চান। দরকার হয় বিষয় ঘনত্ব, সংহত কথাশিল্পের নিটোলতা, অনুষঙ্গের সঠিক নির্বাচন।[৯]

কবির সাথে কাব্যের যে সম্পর্ক তা ভালোবাসার। এই ভালবাসার যে শর্ত মাটিকে জানা, মাটির মানুষ ও তার পরম্পরাকে জানা, দেহ মন দিয়ে গড়ে ওঠা জীবনের মিথকে জানা কবিরুল ইসলামের কবিতায় তার অভিষেক স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন রমেন আচার্য। তিনি কবিতায় ছবি আঁকেন, চিত্রকল্প রচনা করেন। আর চিত্রকল্প গুলি প্রশান্তি ও সরলতার যুগলবন্দী। সেগুলিতে লোকজীবন চিত্রের বিস্তার অনুভবে বাঙ্ময় হয়েছে।

শব্দ চয়নের যথাযথ মুন্সিয়ানায়, ছন্দ ব্যবহারের অবলীলায়, নিজস্ব একটি কবিতার ভুবন তৈরির ক্ষমতায় রমেন বিশিষ্ট ও বিভাময়। তাঁর কবিতার ভাষায় অভিজ্ঞতার ভুবন এইভাবে উঠে আসে-

'হিমে ভেজা লক্‌লকে লাউডগা যেমন চায়
অবিরাম ছোটার জন্য দীর্ঘ সবুজ কার্পেট
আর দুঃখী যেমন চায় তার স্বপ্ন বোনার জন্য
নক্ষত্রের ক্ষেত, তেমনি
মানুষ চেয়েছে গল্প।
যে গল্প
তার রুগ্ন হাত ধরে বলবে - 'ওঠো'।[১০]

'হিমে ভেজা লক্‌লকে লাউডগা' লোক ঐতিহ্য মূলক শব্দ বন্ধ। আবার 'দীর্ঘ সবুজ কার্পেট' একদিকে যেমন লোকচেতনা সঞ্জাত, অন্যদিকে তেমনি নিসর্গের রূপে তন্ময়।

কৃষ্ণা বসুও কাব্যকায়া নির্মাণে 'গল্প' শব্দটি ব্যবহার করে তাঁর প্রাণময় অনুভবকে জাগ্রত রাখেন এইভাবে-

'নদী তাকে এই গল্প বলে,
বাতাস বহন করে শীত, অঘ্রাণের শীত
কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাশের গ্রামে নবান্নের খবর আসে'।

('নবান্ন ও ফাঁকা মাঠ'/'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা'-অশোক কুমার মিশ্র / পৃঃ ৪০৫)

তাঁর ব্যবহৃত শব্দ সম্ভার কালবোধক হয়ে দাঁড়ায় 'শীত', 'অঘ্রাণ', 'নবান্ন' প্রভৃতির ব্যবহারে।

কবি প্রভাত কুমার মিশ্রও 'গল্প' বলেন - 'কফিনের গল্পের কথা'-

'এ গল্প কাদার গল্প হলে
সামনে পিছনে জমি অন্তহীন,

ভেসে থাকা-

পাখির কাকলি।' ১১

অনেক কবির মতো রাঢ় বাংলার খন্ড চিত্রকে তুলে এনেছেন প্রদীপ বসু। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে লেখা 'ছৌ জীবন' কাব্যের নাম কবিতায় তিনি লিখেছেন -

আমরা ছোট মানুষ

ডাল ভাত জনতা পোষাক টালি ছাওয়া ঘর

.....আমাদের ছোট আত্মা ছোটকথা ভাবে।'

এদেরই কথা বলতে গিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 'নিসর্গের কাছেই' কবিতায় বলেছেন-

রাতের অলৌকিক জ্যোৎস্নার ভিতর

অনিন্দ্য নিসর্গের খুব কাছাকাছি

ঝুপড়িতে গরীবেরা থাকে।'

উপরোক্ত দুই কবির ব্যবহৃত শব্দগুলি বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জীবন্ত করে তোলে। এঁদের শব্দ প্রয়োগ সহজ ও আন্তরিক।

জয় গোস্বামীর একটি কবিতার উল্লেখ রয়েছে সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা' (২য় খন্ড) গ্রন্থের ৩২৭ পৃষ্ঠায়- 'হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে'। কবিতাটির এক জায়গায় গ্রামীন প্রকৃতির কথা পাই -

'সেই সব মজা দীঘি, সেই সব তালগাছের সারি

সেই সব পুকুর ঘাট, হাঁটু উঁচু ঘাসের জঙ্গল

সেই সব ধানের গোলা, তুলসিমঞ্চ, গোয়ালের আলো

তার মধ্যে এঁকে বেঁকে একটি বিষাদ নদী বয়

সকাল বেলার রোদ লাফ দিলো নারকেল গাছের শাখায়

দুপুর বেলার রোদ ঝিমঝিম ঝিমঝিম আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে

বিকেল বেলার রোদ একা মাঠে সাইকেল আরোহী, খাটো ধুতি

হ্যান্ডেলে ঝোলানো থলে, মাঠ ছেড়ে দূর ঢালু দিয়ে

নেমে যাচ্ছে আলপথে, সন্ধে নামবে এইবার,

পাখিরা কলস্বর নিয়ে, নিজের নিজের গাছে ফিরে আসছে,

গাছের তলায় পরপর চালাঘর, দাওয়া আর বাঁশ বেড়া।'

'সেই সব' শব্দদ্বয়ের দ্বিরুক্তি থেকে পুনরুক্তি কবিতাকে শুধু গতিজাড্য দান করেনি, শব্দের অনুকারী শক্তিতে চমৎকার সব বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন কবি। কবির শব্দ রুচির নিজস্বতা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এখানে শব্দের ব্যবহার স্বাদু ও বৈচিত্র্য সঞ্চারী হয়েছে।

খুব সহজ ও অনায়াস ভঙ্গি কবির। জীবনের উপলব্ধি ও অর্জিত অভিজ্ঞতায় সত্যের দিকে হেঁটে যায় জয় গোস্বামীর কবিতা। বক্তব্যের স্বচ্ছতায় পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে যান কবি। সময় ও সমকাল, লোকজীবন ও তার পরিপার্শ্ব বিষয়ে সুতীব্র সচেতনতা, লোকচর্যার প্রতি দরদ আর সময় সচেতনতার যৌগপত্যে কবির কবিতা প্রাণবন্ত হয়েছে।

উপরোক্ত কবিতাংশে গ্রাম-বাংলার যে চিত্রময় বর্ণিল রাজ্য উপস্থাপিত, তাতে উপভোগ্য নান্দনিক মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। দেহাতি অভিজ্ঞতা না থাকলে এ ধরণের চিত্র নির্মাণ করা কবির পক্ষে সম্ভব হত না। এই গ্রাম-প্রকৃতি থেকেই জয় গোস্বামী খুঁজে পেয়েছেন কবিতায় একাধিক রূপকল্প নিমার্ণের উপকরণ। গ্রাম-বাংলার জীবন্ত প্রতিবেশ কবিকে দৃশ্য ও দৃশ্যকল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করে। গ্রাম-জীবনের প্রকৃতি ও লোকজীবনের ছবি আঁকেন তিনি শব্দ-শক্তির ব্যবহারে। বেশ বোঝা যায়, অন্তমিল সৃষ্টিতে জয় গোস্বামী আগ্রহী নন, অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারেও তিনি পক্ষপাতী নন। অতি প্রচলিত সাধারণ শব্দ দিয়েই তিনি নির্মাণ করেন অসংখ্য চিত্রকল্প - যেগুলিতে আছে লোকজীবনের প্রতি গভীর প্রত্যয়।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার

১. সামন্ত সুবল সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা' ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা (২য় খন্ড) / পৃষ্ঠা ১৩২

২. মিশ্র অশোক কুমার - আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা / পৃষ্ঠা ৩৭৯

৩. সেন অরুণ - কবিতার দায় কবিতার মুক্তি / পৃষ্ঠা ৩১

৪. সামন্ত সুবল সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা' ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা (প্রথম খন্ড / পৃষ্ঠা ৪১)

৫. দেশ (৮ জুলাই ২০০০)/ গ্রন্থ আলোচনা - অরুণাংশু ভট্টাচার্য / পৃষ্ঠা ৭৯

৬. তদেব

৭. ইসলাম কবিরুল / কাব্য ঃ বিদায় কোন্নগর, 'পুতুল ও প্রতিমা' ।

৮. সামন্ত সুবল সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা' ঃ সৃষ্টি স্রষ্টা (২য় খন্ড) থেকে গৃহীত/ পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১

৯. তদেব / পৃষ্ঠা ১৭৮

১০. মিশ্র অশোক- আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা / পৃষ্ঠা ৩৯৮

১১. তদেব / পৃষ্ঠা ৪১০